মানব সাগর সঙ্গমে

নবকুমার বসু

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৩৬৮ সন

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু
৫৯৫ সারকুলার রোড
হাওড়া-৪

ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ওয়েলনোন্ প্রিণ্টার্স
১২৪ বি, রাজা রামমোহন রায় সরণি
কলকাতা-৯

মুদ্রক
শ্রীললিতমোহন পান
লক্ষ্মী জনার্দন প্রিণ্টার্স
২৬/২এ, সিমলা রোড
কলকাতা-৬।

উৎসর্গ

আমার মা ৺গৌরী বসুর উদ্দেশ্যে

দশ বছরেরও বেশি সময় পূর্বে লেখা "মানব সাগর সঙ্গমে" যে এই বিরানব্বই-এ বই আকারে প্রকাশিত হতে পারল, তার পূর্ণ কৃতিত্ব প্রকাশক সুনীল মণ্ডল মহাশয়ের। আশির দশকের একেবারে গোড়ার দিকে বিচিত্র একধরনের শূন্যতায় আক্রান্ত হয়ে খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে গিয়েছিলাম গঙ্গাসাগর মেলায়। আজও জানি না, কী রসায়ন আমার মধ্যে তখন কাজ করেছিল ওই সিদ্ধান্ত নিতে। ঝোড়ো কাকের মতো ফিরে এসে "মানব সাগর সঙ্গমে" লিখেছিলাম। কিঞ্চিত সংক্ষিপ্তাকারে ছাপা হয়েছিল 'দেশ' পত্রিকায়। বই করার আশ্বাসে আন্তরিক এক প্রকাশক দীর্ঘকাল পাণ্ডুলিপি জমা রেখেছিলেন। বই হয়নি। পাণ্ডুলিপি বিধ্বস্ত হয়েছিল। সেই অবস্থাতেই বই ছাপার ঝুঁকি নিয়ে আমায় কৃতজ্ঞ করলেন বর্তমান প্রকাশক। এত বছরের মধ্যে গঙ্গাসাগর মেলার চেহারা চরিত্রে কিছু পরিবর্তন ঘটলেও, লেখাটি অবিকৃত সেই সময়ের।

নবকুমার বসু

মনের কথা আর মুখের কথা এক নয়। মুখের কথা গলার স্বরে শব্দ মিশে বেরিয়ে পড়ে, মনের কথা শুধু পাক দেয়। নীরবে টানা-পোড়েন চলে নিজের মধ্যে। বেরোয় আর না। মুখে তো কতোই বলি আমি এক, অভিন্ন। কিন্তু কথাটা যে সত্যি নয়। এক আমার মধ্যেই যে কতো আমি, সত্যি কথা বলতে কি, তার সবটাই কী এই "আমি" জানে! কী বিড়ম্বনা, নিজের মধ্যে নিজের সঙ্গে ছলচাতুরী লুকোচুরি। ভাবনাচিন্তার সুতো ধরে টান দিই; দেখি, কচকচি-টাই বড়ো গোলমেলে জট পাকানো। মুখটা আমার, মনটাও। তবে এতো গরমিল কেন? এ সমস্যার কী সমাধান! মন বলে দক্ষিণে, মুখ বলে উত্তরে। মন বলে, ওরে পালা। মুখ বলে, থিতু হয়ে বোসো।

তো মন আর মুখের এই টালবাহানায় একটি কথা খাঁটি। আকর্ষণ হোক কি বিকর্ষণ হোক, অবস্থান হোক তাদের ভিন্নমুখী দুই মরুতে, টানাটানির দোলদোলানিটা এইসব মেলান "আমি"র মধ্যেই। যোগাযোগ তাই একসময় কিভাবে ঠিক হ'য়ে যায়। দেখি, অদৃশ্যে অলক্ষ্যে ভাব ভালোবাসা পাতিয়ে পাশাপাশি গলাগলি চলতে শুরু করেছে। না চলে উপায় নেই, তাই বলেই কী? নয়তো এই অবস্থায়, কী আর বলি, সংসার যখন বুকে হাঁটু দিয়ে ডলছে পিষছে, ঠিক সেই সময়টিতে কল্পনা করা যায়, ঘরের ভাবনা হুট্ বলতে শিকেয় তুলে চরে ঘুরে আসার কথা!

তবে ওই হলো, যাকে বলে মনের কথা। স্বর নেই, শব্দ নেই, ভাষা হয়ে ঝরঝরিয়ে বেরিয়ে পড়ে না। পাক দেয়, শুধু পাক দেয়। মুখের কথা নয় যে পাঁচমিশেলি পাঁচালীর মধ্যে বকম বকম করে বেরিয়ে পড়বে। সংসারের আর পাঁচজনের সামনে মুখের কথা উল্টো

গায়। মনের কথা মুখের গোড়ায় থমকে থাকে, খসে আর পড়ে না। ছটফটিয়ে মরে আর তলে তলে মওকা খোঁজে। অদৃশ্য আয়নায় দেখতে পায় খাঁ খাঁ প্রান্তর ধু ধু বালুচর।

চর নয়তো কী! কাব্য করে না হয় বলতে পারি বেলাভূমি, সমুদ্র সৈকত। কিন্তু তফাৎ তাতেই বা আর কতোটুকু! বালুচর বালুচরই। বছরের মধ্যে ক'টি দিন ছাড়া তো জন-মনিষ্যির চিহ্ন থাকে না। শুকনো বালির উপর ঢেউ ভাঙা আঁকাবাঁকা রেখায় ফেনার দাগ, ভেসে আসা আধপোড়া খড়কুটো, মরা ফুল। শুশুকের কাঁটায় ঝমঝম শব্দ শুনে চমকে ওঠে রোগা নেড়ি কুকুর। দাঁত বের করা ক্ষুধার্ত মুখে জিভ হ্যালহ্যালিয়ে ছুটে যায় খাদ্যের আশায়। ভুল করে, হাওয়া শুঁকে ফিরে আসে। তার ঊর্ধ্বমুখ ক্ষুব্ধ সরু গলার ডাকে নির্জনতর করে তোলে প্রান্তর। ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ ভাঙে। শান্ত গম্ভীর ভোঁ দিয়ে জাহাজ এগিয়ে যায় সুদূরের টানে। আলো বাতাস আর জলের খেলা চলে নিরন্তর।

তবে হ্যাঁ, ওই ক'টি দিন। তিনশ' পঁয়ষট্টি দিয়ে ওই কদিনের জনসমাগমের সংখ্যাকে ভাগ করলে হয়তো দেখা যাবে ফাঁকা পড়ে থাকার খাঁই মিটিয়ে নিয়েছে। ইতিহাসে উল্লেখ নেই, উপাখ্যানে আছে—সেই কবে নাকি একবার মহামান্য দোর্দণ্ড প্রতাপ সগর রাজার ষাট হাজার তাগড়া ছেলে (ষাট হাজার! কী জানি। উপাখ্যানের ষাট হাজার কী প্রকৃতপক্ষে মাত্র ছটি সগর তনয়েরই প্রবল বিক্রম আর অসীম সাহস ইত্যাদি বোঝাতেই ?) খোলা কৃপাণ হাতে টগবগিয়ে ঘোড়ার ক্ষুরে ধুলো উড়িয়ে ছুটে এসেছিল স্বর্গমর্ত্য তোলপাড় করে অশ্বমেধের ঘোড়া খুঁজতে।

কিন্তু সগর রাজার ছেলেরা জানতো না এই নির্জন ধু ধু চরের একপ্রান্তে নিরালায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন কপিল মুনি। দূর থেকে মুনির তপস্যাগৃহ আর আশ্রমকুটির দেখে ছেলেরা ভাবলো তবে নিশ্চয়ই তাদের প্রার্থিত অশ্ব লুকানো আছে এখানেই কোথাও। এদিকে

ইন্দ্র ঘোড়া লুকিয়ে রেখে মিটিমিটি হাসি নিয়ে স্বর্গ থেকে দেখতে লাগলেন সগরপুত্রদের কাণ্ডকারখানা। কপিল মুনির আশ্রমের সামনেই হম্বিতম্বি গোলমাল ভাঙচুর করে এক কেলেঙ্কারী করলো তারা। ধ্যানভঙ্গ হলো মুনির। ক্রুদ্ধ অপমানিত হলেন রাজপুত্রদের আচরণে। ছেলেরা বুঝলো না কার সামনে তারা কী কাণ্ড করছে। চরমে উঠলো তাদের আস্ফালন। শেষে ফলও হলো নিদারুণ। মুনিবরের কোপানলে ভস্মীভূত হতে হলো সেই ষাট হাজার ছেলেদের।

সেই শুরু। সহস্র সহস্র মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তখন থেকে শুরু হলো বেঁচে ওঠার জয়গান সেই ধু ধু বালুচরে। সগর রাজা ছুটে এলেন। নির্বংশ হবেন তিনি। সুতরাং শেষ রক্ত বিন্দু দিয়েও তাঁকে পুত্র-দের আচরণের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কপিল মুনির মন টলানোর আরাধনায় বসলেন তিনি।

দিন যায়, মাস যায়। মুনি হলে কী হবে, মন তো তাঁরও আছে। সগর রাজার তপস্যা আর অধ্যাবসায়ে খুশি হয়ে বললেন—একমাত্র গঙ্গাকে এখানে নিয়ে এসে যদি তার পুণ্য সলিলের স্পর্শ দেওয়া যায় ছেলেদের, তাহলেই তারা বেঁচে উঠবে এবং পরে তাদের স্বর্গপ্রাপ্তিও ঘটবে। ভগীরথ উঠে পড়ে লাগলেন গঙ্গাকে মর্ত্যে আনবার জন্য নয়তো বংশের মান থাকে না। ঠাকুর্দা অংশুমানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন গঙ্গার সাধনা করতে। শেষে গঙ্গা এলেন। তাঁর পুণ্য ধারাস্রোতে বেঁচে উঠলো সগর রাজার ছেলেরা। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যে উপাখ্যানের শুরু, জীবনের মধ্যে ফিরে এসে এই প্রথম সে তার মোড় ঘোরাল। চললো আরও অনেক আখ্যান উপাখ্যান ঘটনা দুর্ঘটনার ঘনঘটা। সময়ও চললো বয়ে। চরের বালুর উপর জমলো আরও কতো স্তর। জোয়ার ভাঁটার টানা হ্যাঁচড়ায় উথালি পাথালি হয়ে চললো নীল সাগরের জল।

কিন্তু তারপর?

তারপর একদিন চিরসন্ধানী মানুষ যাচাই করতে চাইলো গপ্পো

আখ্যানে যতোটা রটে, আসলে কি সত্যি তার কিছু ঘটে! কখনও ঘটেছিল রোমহর্ষক সেইসব ঘটনার সামান্য কিছু? গল্পের গরু গাছে চড়ে বটে, কিন্তু সেই গল্প বাঁধতে গেলেও তো গাছ আর গরুটিকে সত্যি হওয়া দরকার।

সেই সত্যের উৎস হিসাবে ধরা গেল গঙ্গা নদীকে। তারপর একদিন স্তব্ধ চরাচর আর তিরতিরে নদীর বুকে কৌতূহলের নৌকা নিয়ে মানুষ ভেসে পড়লো। দেখতে হবে সে কোন জায়গা, কোথাকার সেই পুণ্যসলিল যার শুধুমাত্র স্পর্শেই শেষ পর্যন্ত স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটেছিল পাপীতাপী ষাট হাজার সগর তনয়ের!

নৌকা চলছে, চলছে। নগর গ্রাম লোকালয় মাঠ সব দেখতে দেখতে পেরিয়ে যেতে লাগলো। এক সময় দেখা গেল নদীর দুই পারের চেহারা পরিবর্তন হচ্ছে। ক্রমশই অন্ধকার দুর্গম পথ, ঘন জঙ্গলের মধ্যে শ্বাপদের গর্জন। নদী নিজেও যেন কখন থেকে হয়েছে খর-স্রোতা। ঢেউ-এর দোলানিতে বুক ঢিপ ঢিপ করতে করতে মানুষ এগিয়ে চললো অজানাকে জানার সন্ধানে।

দিন যায়, রাত যায়। একদিন নৌকা এসে ভিড়লো চরে। পুব আকাশে তখন ঘষা খড়ির ওপর সবে সিঁদুরের গুঁড়ো ফুটে উঠছে। ভোরের স্নিগ্ধ বাতাস ভেসে আসছে ফুরফুর করে। পালা ক'রে রাত জাগা মাঝি মাল্লারা হৈ হৈ ক'রে উঠলো দাঁড় রেখে দিয়ে। স্তব্ধ বিস্মিত কৌতূহলী মানুষ একসঙ্গে তাকিয়ে দেখলো প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য।

কিন্তু এ কোন জায়গা! তিনদিক জুড়ে দিগন্ত বিস্তৃত সীমাহীন সুনীল জলরাশি দুলছে টলছে। আর একদিকে দীর্ঘকাস্তে ফালির মতন সোনালি বালুচর। ঝিকমিক করছে সদ্য ওঠা নরম সূর্য-কিরণে। কোথায় গেল সেই কখনও হেলেদুলে ছোট্ট মেয়েটির মতো নাচতে নাচতে আসা তিরতিরে নদী আবার কখনও উন্মত্ত খর-স্রোতা! কোথায় গেল সেই কখনও নদীর তীরে হরিৎ বর্ণ গাছ-

গাছালি, মাটির গ্রাম্য কুটির, পাখিদের কিচিরমিচির আবার কখনও দুর্গম অরণ্যের অন্ধকার, পশুদের গর্জন !
নাহ্, এ যে নতুন জায়গা। এ কোন অজানা অচেনা সুন্দর ! নির্জন প্রান্তরে মানুষ একে অপরের দিকে বিস্মিত বিহ্বল দৃষ্টিতে প্রশ্ন নিয়ে তাকাতে লাগলো। তবে কী এই সেই সঙ্গম ! নদী এসে মিশেছে সীমাহীন সাগরে ! এই কী তবে সেই চর, উপাখ্যানের কথায় যেখানে ভস্ম হয়ে গিয়েছিল সগর রাজার ছেলেরা ! কিছু একটা তা'হলে সত্যিই আছে ! করজোড়ে মানুষ প্রণাম জানালো প্রভাতী সূর্যের আলোয় তার সদ্য আবিষ্কৃত সঙ্গমকে। বোধন আর বিসর্জন একাকার হ'য়ে যেখান থেকে উঠে গেছে স্বর্গের সিঁড়ি। পাপ পুণ্য জরাজীর্ণ লোভ ক্ষোভ দুঃখ হতাশা আনন্দ জীবন মৃত্যু সব কিছুর প্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে এখান থেকেই দেখা যাবে অন্য আর এক লোকের দৃশ্য। এই তবে সেই মোক্ষলাভের পুণ্যসলিল যেখানে স্নাত হ'য়ে সার্থক হবে মনুষ্য জন্ম। চরম ক্লান্তির শেষে মানুষ পরম আনন্দে অবগাহন করলো সঙ্গমের পুণ্যসলিলে।

কিন্তু কী কথা বলতে গিয়ে কোথায় এসে পড়লাম ! গপ্পো করার নেশা আমাদের হাড়ে মজ্জায়। এক ধারায় আরম্ভ করলে অজান্তে কখন পাঁচ ধারায় বহে। বাপ মা সব আগল খুলে দিতে শিখিয়েছে, বন্ধ করার কানুন জানি না। নয়তো সাগর সঙ্গমের কথা বলতে বসে ফেঁদে বসেছিলাম প্রায় রামায়ণের আদিকাণ্ডের গপ্পো।
সে যাক্। বলছিলাম এই অবস্থার কথা। আসলে অবস্থা তো নয়, আপাততঃ একেবারে তিন অবস্থা। দিব্যি টের পাচ্ছি, ঝোঁকের মাথায় কালাপানি পার হওয়ার ধকল এখন দাগড়া দাগড়া হ'য়ে গায়ে ফুটে উঠছে। দিনকে দিন সংসারের অলিখিত অনিবার্য সব চাহিদা জলহস্তীর হাঁ করা মুখের মতন ধেয়ে আসছে। বস্তুবাদী পৃথিবীতে আমার মতন অপরিণামদর্শী, না-ঘরকা না-ঘাটকা মানুষ-

জনেরা চোখ খুলে সামনে তাকালেই দেখে সংসারের বড় বড় দাঁত, যাঁতাকলের আতংক। অথচ তা সত্ত্বেও কী লজ্জার কথা, এর মধ্যেও আর একটা কে আমার মধ্যে ফিক ফিক করে হাসে। মনে মনে নিজেকে দাদামশায়ের কথাগুলো মনে করিয়ে দিয়ে বলি, ওরে, "নির্লজ্জের নাহি লাজ নাহি অপমান, সুজনকে এক কথা মরণ সমান" এসব গালাগালি খাওয়ার কথা কী ভুলে গেলি ?

সত্যি বলছি, খুব ইচ্ছে করে সংসারকে কাঁচকলা দেখাই। কিন্তু আবার এও মিথ্যে নয়, কাছে পিঠে ছোট বড় চেনা চেনা মানুষ-গুলোকেও না পেলে বড্ড মোচড় দেয় বুকের মধ্যে। এই যখন নিজের অবস্থা, তার মধ্যেই এক দুপুরের লোড শেডিং-এ ট্যাঁ ট্যাঁ আওয়াজ বের করে পাতলা পাতলা চোখের পাতা পিট পিট করে পৃথিবীর আলো দেখতে চাইলো আরও একটি ঢল ঢল কচি মুখ। তার ছোট ছোট নরম গোলাপী হাত পা কয়েকবার শূন্যে আস্ফালন করে সে জানান দিলো বুকের মধ্যে আর একটি নতুন প্রকোষ্ঠের সৃষ্টিকে।

এবার বোঝ। অনির্দিষ্ট কাল অনুপস্থিতির দায়ে রুজির ধান্দায় পড়েছে লাল ফাঁস, মাথা গোঁজার ঠাঁই হয়েছে বেদখল দখল। প্রায় হেসে ফেলার মতো সামান্য পুঁজিতে পড়ছে ঘন ঘন শঙ্কিত হাত। তার ওপর আত্মাভিমানের তেজ রাখতে গিয়ে···

থাক। এ আর কী বলবো! কার পিছনে নেই ওই জলহস্তীর হাঁ মুখ! নামে তাকে সংসার বলি তো সংসার, জীবদ্দশার কর্ম যদি বলি, তবে তাই। কজনাই বা আর চতুর্বর্গ সিদ্ধ হয়ে কৌপিন এঁটে হিমালয়বাসী হ'তে পেরেছেন! যাঁরা পেরেছেন, সেই ভাবভোলা-নাথেরা নমস্য। কিন্তু পারলেন না যাঁরা অথচ বুকের মধ্যে অহরহ অনুভব করে চলেছেন অদৃশ্যালোকের অস্পষ্ট হাতছানি কিংবা ঠিক যেন বুঝিয়ে বলতে পারি না এমন এক টান—তাঁদের কী বলবো! ঘরেও নহে, পারেও নহে! তবে কোথায় ?

বলতে লজ্জা নেই, জানি না কোথায়। শুধু এটুকু বুঝি ওই দলে

আমিও। কিন্তু সেই যে প্রথমে বলেছি মুখের কথা মনের কথা এক নয়। বোঝাবুঝিটা মুখের কথা হয়ে বেরোয় না। মনের কথাটা চোরাবালির নিচে এক নেশানীল জলের অন্তঃস্রোত যেন। ওপরে শুকনো, ভিতরে টান। কিসের টান, কেন টান, নাহ্, বোঝা হয়নি এখনও। যেন এক চেনা আমি, আর এক অচেনা আমি। দুই-এর মধ্যে বিস্তর অস্বচ্ছতার ভারি পর্দা। চেষ্টা করলেও সহজে স্বচ্ছ হয় না, কিন্তু নিঃসাড়ে জাগানো থাকে টানাপোড়েন, অস্থির ছট্-ফটানি। হঠাৎই কোনো এক অদৃশ্য ইঙ্গিতে উদ্বেল হয়ে উঠি। ভুলে যাই বড় বড় দাঁত, যাঁতাকলের চেহারা। ছ্যাঁচো কোটো মারো লাথি, লজ্জা নাইকো বিড়াল জাতি-র মতো আবারও গুটিগুটি··· । আমার নৈঃশব্দ্যের টানাটানির মধ্যে কখনও জেগে ওঠে এক সূক্ষ্ম অথচ স্পষ্ট সবুজ সংকেত।

আর পারা যায় না। ভয় ভাবনার পিছুটান, সঙ্কুচিত পকেট ভুলে গিয়ে সংসারের দিকে নিখুঁত এক চক্ষু বুজে "উইশ"। ঘরের মানুষ-কে ভুজুং-ভাজাং দিয়ে আগে তো হাঁটা, পরের কথা পরে··· ।

আর এই বলতেই ফিরে আসতে হয় সেই যোগাযোগের কথায়। কী ভাবে ঠিক যেন হয়ে যায়। গাই বাছুরে ভাবের মতন, চিনি খেতে চাওয়া কালো পিঁপড়েকে চিন্তামনির দয়া। ইচ্ছের সঙ্গে উপায় যেন হয় বলে বসে আছে। কতোই বা দূর! বসে তো আছি প্রায় নোনা-মাটিতে। প্রতীক্ষা শুধু পৌষের শেষ দিনটির। সাগর সঙ্গমে হবে মানব সঙ্গম। অল্প জলে লগি মারার মতন নিঃশব্দে প্রাণের কোথায় বুঝি গুলিয়ে ওঠে রঙীন তরল খুশি। চর্মচক্ষুতে দেখা নেই। কল্পনার দৃষ্টিতে দেখি ভোররাতের দরিয়া। আলো ফুটছে পূব আকাশে। নীলচে ঘোলা সঙ্গমের জল থেকে উঠছে গরম ধোঁয়ার ভাপ। লক্ষ লক্ষ ভাবঘোরের পুণ্যার্থী নেমেছেন ব্রাহ্ম মুহূর্তের স্নানে। পুণ্যস্নান। ডুব দিচ্ছেন পুজো করছেন ফুল ছুঁড়ছেন সাগরের জলে তর্পণের তিল ভাসছে। কানে বাজছে লক্ষ পুণ্যার্থীর

পাঁচমিশেলি ভাষা আর কণ্ঠস্বরের কোলাহল। জোয়ার জলের ঢেউ ভাঙছে ঝপাস ঝপাস।

পৌষ মাসের শেষ তারিখে মকর সংক্রান্তির স্নান। পুণ্যসলিলা সঙ্গমে ডুব দিয়ে স্বর্গপ্রাপ্তির আগাম ব্যবস্থা। পাপস্খালনের আদর্শ ধার্মিক উপায়। আমার পাপপুণ্যের বোধ বিশ্বাস অন্যরকম। তবু শরিক হ'তে চলেছি সেই পুণ্যেরই বিশ্বাসে, সামিল হ'তে চলেছি সেই তীর্থযাত্রায়। তথাকথিত বিশ্বাস অবিশ্বাসের কচকচিতে আমার কাজ কী! সন্ধানে মিলায় বস্তু। আমার তো আশা আকাঙ্ক্ষা সন্ধান উদ্দেশ্য সবই কিছুটা ভাসা ভাসা, কিছুটার ধরণ আলাদা। হেলাফেলায় কেটে গেছে জীবনের অনেকটা। দেখেছি পর্বতমালা, দেখেছি সিন্ধু। তবু কিছু বিরল মুহূর্ত জীবনে এসেছে যখন গোড়া ধরে ঝাঁকানোর অনুভূতি হয়েছে এই মাটি জলেরই টানে। অন্য অনেক লোক দেখতে মিশতে গিয়ে মনে হয়েছে, অদেখার অন্ধকারে অপরিচিত থেকে গেছে আপন ঘরের বাসিন্দারা। এবার সামনে সুযোগ। অনেক দেখার এমন সুযোগ কোথায় পাবো! বারবার নয়, গঙ্গাসাগর একবারই। এবার দেখা যাক একবারের ভার কতোখানি।

আর মোটে দেরি নয়। কনসার্টের বাঁশীতে পড়েছে প্রতীক্ষা শেষের ফুঁ। বেরিয়ে না পড়লে বেরুনো হয় না। সুতরাং জয় মা বলে···।

কিন্তু বেরিয়ে তো পড়লাম। হাতে সময়ও রেখেছি অতিরিক্ত একটা দিন। তারপর? যাবো কী ভাবে?

কলকাত্তা কি বাবু আমি প্রায় সর্ব অর্থে। যাঁরা আসছেন রাজস্থান পাঞ্জাব হরিয়ানা বিহার উড়িষ্যা গুজরাট থেকে তাঁরা তো আর সোজাসুজি যাচ্ছেন না। এক ঢিলে বেশ কয়েকটি পাখি মারার বাসনা তাঁদের। অতিরিক্ত সময় রেখেছেন হাতে। তাঁরা হাওড়া স্টেশন থেকে ঘুরপাক খেয়ে চিড়িয়াখানা যাদুঘর ভিক্টোরিয়া পরেশ-

নাথের মন্দির পাতাল রেলের গহ্বর দেখে বেড়িয়ে আশ্রয় নিচ্ছেন দক্ষিণ শিয়ালদা রেল স্টেশনে।

গতরাত্রে নেহাত কৌতূহলবশতঃ শিয়ালদা গিয়ে দেখে এসেছি একটি ক্ষুদ্র ভারতবর্ষের চেহারা। প্লাটফর্মের কোথাও পা ফেলার জায়গা নেই। ডায়মণ্ডহারবার যাওয়ার শেষ গাড়িটিতেও নেই তিল ধারণের স্থান।

রেল কোম্পানী কখানা অতিরিক্ত গাড়ি দেবেন! ভারতবাসীকে দেওয়ার মতো জায়গা রেলকোম্পানীর ক্ষমতার বাইরে। বাদুড় ঝোলা কিংবা গুড়ের নাগরি হ'তে আমরাও শিখে গেছি কবে। কিন্তু অবস্থা তো চোখে যা দেখলাম, তাতে ছুঁচ গলবার উপায় নেই যে। মনে হচ্ছে এ দরজা দিয়ে একজন মরিয়া হয়ে ঢুকে পড়লেও ও দরজা দিয়ে একজন পড়ে যাবে।

এখন উপায়! উপায় আছে। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

কাউকে কিচ্ছুটি না বলে, উলটো কায়দা নিলাম। শিয়ালদাগামী ডায়মণ্ডহারবার লোকালে আগাম চেপে বসলাম যাদবপুর থেকে। উদ্দেশ্য, ফিরতি গাড়িতে শিয়ালদায় লোক ওঠানামার সময় যখন খণ্ডযুদ্ধ চলবে দরজার কাছে, সেই ফাঁকে আমি দখল নেব জানালার ধারে।

কী করবো, এটুকু চালাকির মাথা না খাটালে রণে ভঙ্গ দিতে হয়। ঝুঁকি যে ছিল না তাও না। ফিরতি গাড়িটি ডায়মণ্ডহারবার লোকাল না হয়ে ক্যানিং কিংবা লক্ষ্মীকান্তপুর-এর গাড়ি করে নিজেই গেছি। কিন্তু না, প্লাটফর্মে গাড়ি ঢুকতে ঢুকতেই বুঝলাম, এ গাড়িই আবার ডায়মণ্ডহারবার যাবে তা নিশ্চিত পূর্বঘোষিত। অব্যর্থ ফল। কী বাঁচান বেঁচেছি!

শিয়ালদা স্টেশনে ঢুকে গাড়ি দাঁড়াল একটি ক্লান্ত শ্বাস ফেলে। কোথা দিয়ে কি ঘটলো বোঝার আগেই, মুহূর্তের মধ্যে বোঁচকা বুঁচকি বাসন তোরঙ্গ পোঁটলা পুঁটলি নারীপুরুষ সব মিলে মিশে

বেধে গেল একটি অনিবার্য জট ও যুদ্ধ। সেইসঙ্গে চূড়ান্ত গোলমাল ও চিৎকার। নামার লোক নামতে পারছেন না, ওঠার লোকেদের জিনিসপত্রে গেট জ্যাম। এক ভয়াল পরিস্থিতি।

কিন্তু দেখার উপায় নেই আমার। খণ্ডযুদ্ধের অবকাশে আমি তত-ক্ষণে জানালার কোল ঘেঁষে বসে পড়েছি। আমাদের এখানকার অনেক বিজলি গাড়ির জানালায় এখনও পর্যন্ত শুধু কিছু শিক অবশিষ্ট আছে। সুতরাং ট্র্যাপিজ খেলার কায়দায় জানালা গলে আসার উপায় নেই। নিজের জায়গাটির নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হ'য়ে এতক্ষণে আমি প্ল্যাটফর্মের চেহারা দেখার সুযোগ পেলাম। কাতারে কাতারে মানুষের মাথা ও তাদের ঠাসা জিনিসপত্রে প্রায় একরকম নিশ্চল অবস্থা। তারই মধ্যে গেটের সামনে চলেছে ঠেলা-ঠেলি। আপাততঃ যার যা কিছু আছে নিয়ে শুধু উঠে পড়া। কোনো কথা না বলে চুপচাপ বসে রইলাম। শুধু তাই নয়, অনেকের প্রার্থিত এবং আকাঙ্ক্ষিত জানালার ধারের জায়গাটি আপাততঃ আমার দখলে, এই উষ্ণ নির্লজ্জ অনুভূতি আমার মধ্যে। অনেকের লোলুপ কাড়াকাড়ির মধ্যে নিজের সামান্য স্বাচ্ছন্দটুকু নিরাপদ করে নিতে পারলে আমাদের লুকানো আদিম মানসিকতা কী বেজায় খুশি হয়! নয়তো এই মুহূর্তে আমার ইচ্ছে হবে কেন রেলস্টেশনের *বিখ্যাত এক ভাঁড় "ইহাকে বলা হয় চা" পান করি!*

হায়, আমরা ভারতবাসীরা শুধু সংখ্যায় অনেক বেশি বলে, মনের দিক থেকে মাঝে মধ্যে কীরকম ছোট সঙ্কুচিত হ'য়ে যাই!

ঠাসাঠাসি কামরা। কতটুকুই বা সময়! অথচ এর মধ্যেই পাখা ভেঙে নেওয়া ঝুলকালি পড়া গাড়ির ছাদটুকু ছাড়া আর প্রায় কোনো অংশই চোখে পড়ছে না। অসংখ্য বস্তা আর পুঁটলি পড়েছে মেঝের উপর। বেশ কিছু গোলাপফুল আঁকা টিনের তোরঙ্গ। নারীপুরুষ বৃদ্ধ নির্বিশেষে যে যেখানে পেরেছেন বসে পড়েছেন। নিঃসংকোচে ধকল উপশমের বিড়ি ধরিয়েছেন। এই জানুয়ারীতেও কপালে ঘাম

অথচ উজ্জ্বল চোখেমুখে প্রত্যেকেরই নিশ্চিন্ত জয়লাভের হাসি। প্রচুর খোসগপ্পো। সাধুবাবা গোছের একজন কল্কে বার করে ফেলেছেন। সেটি ন্যাকড়ায় জড়িয়ে নানাবিধ ঠাকুর দেবতার নাম স্মরণসহ তিনি ব্যোম ব্যোম উচ্চারণে মরণপন টান দিচ্ছেন। দেখতে পাচ্ছি তাঁর কণ্ঠার নলি এবং বুকের ওপর হাড় স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

শাঁখের আওয়াজ ভোঁ দিয়ে গাড়ি নড়েচড়ে উঠে সবে ছেড়েছে, কানে এলো একটি নিঃসংকোচ নিরুদ্বেগ "হাম্বা" ডাক। সঙ্গে সঙ্গেই হাসির হররা, মিশ্রিত ভাষায় নানান সরস মন্তব্যও। লক্ষ্য করিনি, করার উপায়ও ছিল না যে কে কখন বেচারি চতুষ্পদটিকেও তালে গোলে কামরার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ট্রেন সবে ছেড়েছে; সুতরাং দুগ্‌গা দুগ্‌গা, জয়গুরু, গঙ্গা মাইকী জয় ইত্যাদি অনেক শুভযাত্রা কামনার সঙ্গেই শুনতে পেলাম—চুপ যা মা ভগওতি, চুপ যা। বুঝলাম চতুষ্পদটির মালিকের গলা। গাড়ি চলার নাড়া খেয়ে হতভম্ব গোশাবকটি বোধহয় অনেকক্ষণ পরে একটি নিশ্চিন্ত ডাক ছাড়তে পেরেছে।

কিন্তু এমনই এক তীর্থযাত্রায় বাছুরটিকে সঙ্গী নেওয়ার কী হেতু ভাবতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ চমকে উঠলাম। মোটা ডাণ্ডার মতন লম্বা অদ্ভুত একটি বস্তু জানালা গলে পড়ল আমার কোলের ওপর। এদিক ওদিক তাকাচ্ছি। হাত দিতেও ভরসা পাচ্ছি না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সীটের আর এক প্রান্ত থেকে মেঝেয় বসা এক দেহাতী যুবকের উৎকণ্ঠিত চিৎকার কানে এলো।

—আরে, এ ছগনোয়া, মেরা ছাতা কিধর চলি গই-ই··· !

ইতিমধ্যে আমিও আমার কোলে পড়া বস্তুটির একদিকে একটি বাঁকান ছাতার বাঁট দেখতে পেয়েছি। তবে কী যুবক ছাতা বলতে এই বস্তুটিরই সন্ধান করছে। হাতে তুলে বাড়িয়ে ধরলাম।

—এ কেয়া আপকা হ্যায় ?

অসম্ভব খুশি হয়ে বিগলিত হেসে যুবক বস্তুটি নিতে নিতে বললো

—হাঁ, হাঁ, ওহি হ্যায় মেরা ছাতা। ব্যাপারটা এতোক্ষণে বুঝলাম। যুবকের সঙ্গে আনা ছাতাটি গাড়ির বাইরে কারো কাছে ছিল। তার আর ট্রেনে ওঠার সুযোগ হয় নি। এদিকে গাড়ি দিয়েছে ছেড়ে। তা সত্ত্বেও বস্তুটি যাতে মালিকের হাতে পৌঁছায় সেই উদ্দেশ্যেই আমার কোলে নিক্ষেপ। কেননা জানালার ধারেই আমি।

গাড়ি প্লাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। বাছুরের ডাক ভুলে তখন অন্য কথা ভাবছিলাম। যে বস্তুটি বাড়িয়ে দিলাম, তা যদি ছাতাই হয়, তাহলে তাকে সুরক্ষিত করার এমন আজব বন্দোবস্ত আমি জীবনে দেখি নি।

বাঁট ছাড়া পুরো ছাতাটিকে কাগজে মুড়ে তার ওপর মোটা করে মাটি লেপেছে। নিশ্চয়ই নরম মাটি ছিলো তখন। অতঃপর তা শুকিয়েছে এবং তৈরি হয়েছে একটি "ছাতাকেস্।" রাষ্ট্রভাষায় তার ওপর মালিক নাম লিখেছে—শ্রীরামশরণ সাউ, দিওয়াস কোঠি, জিলা—কাটিহর, বিহার।

চমৎকার ব্যবস্থা। কতো কি দেখিনি!

ছাতা হাতে পেয়ে উৎকণ্ঠিত রামশরণ বেজায় খুশি। হাসি তার ঠোঁট থেকে আর যায় না। উল্টে পাল্টে অনেকবার সেই আজব বস্তুটি দেখে, হঠাৎ বোধহয় এবার তার আমাকে একটু কৃতজ্ঞতা জানানোর ইচ্ছে হলো। বিগলিত হাসির সঙ্গে একটু এগিয়ে হাত বাড়িয়ে সে বললো—লিজিয়ে বাবু থোড়া টেস্ কিজিয়ে।

একটি সরু লম্বা কাঁচের শিশি থেকে রামশরণ আমাকে একটু মশলা খাওয়াতে চাইছে।

কী মশলা কেমন খেতে কিছুই জানি না। কিন্তু সেসব ভয় ভাবনার আগেই এই আন্তরিকতাটুকু বড়ো ভালো লাগলো। কিছুই করিনি আমি ওর জন্য। তার ওপর বাবু। গায়ে আমার সদ্য বিদেশ থেকে আনা নীল জ্যাকেট, চোখে হালকা খয়েরি চশমা। খুব সূক্ষ্মভাবে

হ'লেও সামান্য একটু বিচ্ছিন্নতা কী আমার মধ্যে এই কামরার পরিবেশের থেকেও ছিল না! কিন্তু এক মুহূর্তেই তা যেন উবে গেল। নানা রকমের নানা মাপের মানুষ হ'লেও আজ তো আমরা সব একই পথের পথিক, সুতরাং কুঁচো সুখ-দুঃখ আনন্দ একটু ভাগাভাগি করে নিতেই বা আপত্তি কিসের?

হাত বাড়িয়ে মশলা নিলাম। মুখেও ফেললাম। মনে হলো হরিতকী আমলকী মৌরি আমচুর সব মিশিয়ে এক চাটনি গোছের কিছু। বেশ লাগলো। আমার অসাধারণ হিন্দীজ্ঞানে বলেও ফেললাম—আচ্ছা হ্যায়।

ট্রেন ছুটছে দাপটের সঙ্গে। অন্যান্য দিনেও গাড়ি ছোটে, কিন্তু এই সময়ের দু একটা দিন ডায়মণ্ডহারবার লোকালের গুরুত্ব ভূমিকা এবং মেজাজ আলাদা। ড্রাইভার সাহেব এসময় মাথায় বাঁকা করে কালো টুপি পরেন। আর এঞ্জিনের দরজা একটু ফাঁক করে কোমরে সামান্য ভাঁজ ফেলে দাঁড়িয়ে থাকেন। সারা ভারতবর্ষ থেকে লোক এসেছেন এই গাড়ি চড়ে যাওয়ার জন্য। বালিগঞ্জ স্টেশনে ঢোকার বেশ আগে থাকতেই গাড়ি তার উপস্থিতির আগাম সংবাদ জানাতে থাকে ঘন ঘন ভোঁ বাজিয়ে।

কিন্তু আশংকা হলো বালিগঞ্জ স্টেশনেও সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা থিকথিকে জনসমুদ্র দেখে। আর কোথায় উঠবে লোক! ইতিমধ্যে ছাদের ওপরেও দাপাদাপির শব্দ পেয়েছি। কিন্তু এই তো সবে শুরু। আপাততঃ এই সমস্ত যাত্রীর প্রাথমিক গন্তব্য ডায়মণ্ড-হারবার। সেখান থেকে বাসে ট্রাকে টেম্পোতে কাকদ্বীপ অথবা নামখানা। তারপর বুড়িগঙ্গা কিংবা বড়তলা নদী পেরিয়ে কচু-বেড়িয়া অথবা চেমাগাড়ি। সেখান থেকে বাস অথবা খোলা রিক্সায় সাগরদ্বীপ টার্মিনাস। তারপরেও হাঁটা পথে আরও মাইলদেড় গিয়ে সঙ্গমের মেলা। কী করে পেঁছবে এই বিশাল জনসংখ্যা! একটা গাড়ির ভিড় দেখেই আমার চক্ষু চড়কগাছ। শুনেছি বিগত কয়েক-

দিন ধরে এক একটা গাড়িতে এই একইরকম জনস্রোত দিনের মধ্যে গোটা বিশেক ট্রেনে চেপে ক্রমাগত পেঁছাচ্ছে।

ভেবে আমার লাভ নেই। কপালগুনে সাগরমেলায় যাওয়ার আগে এমন এক বন্ধুর আমন্ত্রণের চিঠি পেয়েছি যিনি একজন কুলীন সরকারী অফিসার। পদমর্যাদায় উপ-জেলাশাসক। সাগরসঙ্গমে পেঁছানোর গতি আমার হয়ে যাবে—এই মানসিক প্রস্তুতি আমার রয়েছে। পরেরটা পরে ভাববো। আগে তো গিয়ে পেঁছাই।

তবে এই মুহূর্তে চলন্ত ট্রেনের কামরায় যে পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি, তাতে যেন মনে হয়, আমার ঘর থেকে বেরুবার আগে যে নিঃশব্দ তাড়না ছিল মনে মনে, তারই প্রস্তুতি। আদপে তীর্থ-যাত্রা কিংবা ধর্ম মাহাত্ম্যের ব্যাপারকিছু না। যদিও জানি আসল উদ্দেশ্য একটি ভাবগম্ভীর তাত্ত্বিক মানসিকতায় গড়া।

এখন ধিম তাকা, ধিম তাকা বোল উঠেছে মাটির হাঁড়িতে। ঝুনুক ঝুনুক ঠেকা বাজছে কাঠে আর টিনের পাতে। গলা মিলিয়ে সদ্য দুলকি চালের গান ধরেছে কয়েকজন। একেবারে দেহাতী বিহারী গান।

"আরে মোটে মোটে রোটিয়াঁ, পাকা দে দো দুনিয়া"—চড়া সুরে, তারপরেই লাগ ঝমাঝম বাজনার সঙ্গে—"আইয়ে রাম যাইয়ে রাম।"

"সব মিলজুলকে করো আভি রঘুপতি কা নাম, আইয়ে রাম যাইয়ে রাম।"

রীতিমত জমাটি পরিবেশ। বাজনা আর তালের ঠেকায় ক্রমবর্ধমান দ্রুত লয়। অংশগ্রহণে গায়ক গায়িকার সংখ্যাও দিব্যি বাড়ছে। সুতরাং এই পরিস্থিতির পূর্ণতার জন্য যা অবধারিত, দেখতে পাচ্ছি তা-ও শুরু হলো বলে।

ভিড়ের মধ্যেই ঠেলাঠেলি করে মাঝখানে সামান্য জায়গা। খাটো ধুতির ওপর গামছা এঁটে গায়ের জামা খুলে দাঁড়িয়ে পড়েছে দুটি তাজা তাগড়া যুবক। অজস্র উৎসাহী সমর্থক তাদের। যুবকেরা

দাঁড়ানো মাত্র হল্লা, হাসির হুল্লোড় এবং চটাপট হাততালি পড়ে গেল। গানে বাজনায় অতিরিক্ত উচ্চকিত সংযোজন। যেন এই পূর্ণতা-টুকুর প্রতীক্ষাই চলছিল। শুরু হয়ে গেল নাচ। কোমর ভেঙে বাঁকিয়ে মোচড় দিয়ে নাচ। কোমরের গামছা খুলে চলে আসছে হাতে, তাই দিয়ে চেলির মতো ঘোমটা। মন্দিরের চূড়ার মতো হাত তুলে, ঘাড়ে বক-দোলানি। হাতের মুদ্রায় ঢেউ, চোখ আর ভ্রূর নড়া-চড়ায় মেজাজী ইঙ্গিত। ঘুরে ফিরে বসে দাঁড়িয়ে মাজায় দোলা।
আহা, অপূর্ব! কী নাচ বলবো একে জানি না। তবে, বাজনা গান আর নাচ সব মিলিয়ে এই পরিবেশের এমনই গুণ যে, অস্বীকার করবো না, আমারও চুপচাপ বসে থাকতে বেশ কষ্টই হচ্ছিল। নেহাত ঠাসাঠাসি জায়গা, নড়াচড়ার উপায় নেই। নয়তো বলা যায় না ভাব আর তালের দোলায় হয়তো আমার কোমরেও দোলা লেগে যেত। হাতে তো তাল ঠুকছিই।
অবশ্য উলটো ব্যাপারটাও দেখতে পাচ্ছি। আমাদের কামরার মধ্যেই কয়েকজন রীতিমত অস্বস্তি এবং বিরক্ত বোধ করছেন। তাদের কুঞ্চিত ভ্রূ আর ঠোঁটের কোণে অনুচ্চারিত "নাষ্টি" শব্দটি ঝুলে রয়েছে। নিশ্চয়ই আঁতে লাগছে তাঁদের। কেন জানি না এইদিনের মানসিকতা তাঁরা মানতে পারছেন না। নিজেদের উপস্থিতি অসম্মানকর মনে করে রাশভারি হয়ে রয়েছেন। কী করা যাবে! তাঁরা থাকুন তাঁদের নিয়ে।
চড়া গান বাজনা নাচের সঙ্গেই বিভিন্ন ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়েছে কামরা। ন্যাকড়া জড়ানো একটি কল্কে এবার হাতে হাতে ঘুরছে। হাসি হল্লা মস্করা রসিকতায় আপাততঃ যে পরিবেশ,কে বলবে এটি একটি প্রমোদ ভ্রমণ নয়! সাধন ভজন তীর্থ পুণ্যের ব্যাপারটা যেন উপলক্ষ্য মাত্র। আসলে মুক্তির আনন্দে গা ভাসানো। বাস্তব জীবনের ভারি জোয়াল কাঁধ থেকে নামিয়ে, কটা দিনের জন্য বুক ভরে শ্বাস নেওয়া। ধর্মতত্ত্বের মশলা দিয়ে খানিকটা স্বাধীন সুখের পান

চিবুলে ক্ষতিটাই বা কী !

কোথা দিয়ে সময় কেটে গেছে। গাড়ি পেঁছেছে ডায়মণ্ডহারবার। এর মধ্যেই শীতের সুখী রোদ ঢলে পড়েছে পশ্চিমে। ছায়া পড়েছে লম্বা হয়ে। পায়ে আমেজি ঠাণ্ডায় শিরশিরিনি।

নেমেই বোঝা গেল শহরের চেহারায় আজ অন্য এক চেকনাই। স্টেশন চত্বরে বেশ কিছু নবাগত ব্যবস্থা। বাঁশ দড়ি দিয়ে বাঁধা যাওয়া আসার পৃথক লাইন। শয়ে শয়ে স্বেচ্ছাসেবক আর পুলিশ যাত্রীদের নিয়ন্ত্রণ করছেন। প্রয়োজনে উপদেশ নির্দেশ দিচ্ছেন, জানিয়ে দিচ্ছেন পরিবহনের সঠিক ভাড়া। কিছু সাময়িক ছাউনি পড়েছে প্ল্যাটফর্মের বাইরে—বেশি রাত্রে পেঁছান যাত্রীদের মাথা গোঁজার ঠাঁই।

কাঁধে ব্যাগ ঝুলিযে সর্বভারতীয় ভিড়ের স্রোতে ঠেলা খেতে খেতে গেট-এ পেঁছালাম। নিজেকে নিয়ে এ পর্যন্ত পেঁছানই ছিল আমার ব্যক্তিগত দায়িত্ব। টিকিট দিয়ে বেরুতেই দেখি পরিচিত মুখ —এই যে, এদিকে।

বন্ধু নিজে আসতে পারেন নি। উপ-জেলাশাসক তিনি, আসতে পারার কথাও না। সরেজমিন পরিচালনায় ব্যস্ত আছেন পারা-পারের ঘাটে। যাঁকে পাঠিয়েছেন তিনিও একটি রসের রসিক আমা-দের। সুদূর ডায়মণ্ডহারবার থেকে মাঝে মধ্যেই রবিবাসরীয় আড্ডার ভিয়েনে জমতে আসেন।

কাছেই বন্ধুর বাংলো। প্রথম পর্ব হাতমুখ ধোওয়ার পর চা সহযোগে কথাবার্তা ঠিক হলো। মকর সংক্রান্তির দু'দিন আগে পেঁছেছি, কিছু অতিরিক্তের প্রত্যাশা ছিল বলেই। প্রথম রাত্রি কাকদ্বীপে থাকার বন্দোবস্ত। দ্বিতীয় দিন ভোরে রওনা হবো সাগরদ্বীপের উদ্দেশ্যে। সারাদিন সারারাত্রি সেখানে কাটিয়ে, তৃতীয় দিনের যে কোনো সময় ফেরার কথা ভাববো।

বাইরে বেরিয়ে পড়ার অস্থিরতা অনুভব করছি। খানিকটা এগিয়ে এলেও আসল জায়গা থেকে এখনও বেশ দূরে। মনে হচ্ছে, এইখানে একটি সুন্দর ঘরে বসে থেকে সময়ের অপচয় হচ্ছে। স্টেশন থেকে হাঁটাপথে বাংলো পর্যন্ত আসার সময় দেখেছি উৎসবের সাজ সাজ রব। ফুটপাথে হাঁটা দায়। পাকা রাস্তায় যানবাহনের ব্যস্ততা। বাস ট্রাক টেম্পোয় গাদাগাদি করে মানুষ ভরে চলেছে লাগাতার যাত্রায়। দোকান পাটে অবিরাম বেচাকেনা। স্বাগত শুভেচ্ছার বাণী ঝুলছে বড় বড় রঙীন হোর্ডিং-এ।

ঘরে বসে দিব্যি অনুভব করছি, আসলে বাইরেই রয়েছে একটি রসিক আমন্ত্রণের ডাক। অথচ কেন এমন মনে হয় ঠিক যেন বুঝে উঠি না। আমদের দুর্গা কিংবা কালী পুজোতেও তো রাস্তাঘাট দোকান সর্বত্র থিকথিক করে ভিড়। গমগম করে বিভিন্ন পাঁচমিশেলি কোলাহলে। তার মধ্যে যাওয়ার জন্য মন তো এমন হাঁকপাঁক করে না। বরং অনেক ক্ষেত্রে উল্টোটাই হয়েছে। দরজা জানালা বন্ধ করে কুলুপ এঁটে বসে থাকতেও ইচ্ছে করেছে কখনও। আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টির সস্তা চটকদারিকে অত্যাচার বলে মনে হয়েছে। চতুর্দিক থেকে মাইকের আওয়াজে মাথা ঝিমঝিম করেছে। পট্‌কার শব্দে হয়েছি তিতিবিরক্ত। অথচ এখন মনে হচ্ছে নিজের মধ্যে কে একটা কলের গানের প্যাঁচ ঘুরিয়ে চলেছে, দম কমছে না একবারও।

কেন, কেন এমন হয়।

সাহস করে মনের কথা যে খোলসা করে বলবো, সে ভরসাও তো পাই না ছাই। নিজের কাছে নিজেই যে পরিষ্কার হই নি পুরো-পুরি। চোরা চোরা ভয় ভয় লাগে। লেখার কথা কালো কালিতে ছাপা হয়ে গেলেই এক অর্থে দলিল। হুল গজানো তাত্ত্বিকের দৃষ্টি বাঁকা চোখে তাকাবে; বলা যায় না বলতে পারে, কালকা যোগী! অবশ্য বাঁচোয়া আবার সেখানটাতেই। যার কিছু নেই, তার হারা-নোরও কিছু নেই। প্রাণের কথাটা বলার মুহূর্তে সত্যি ভেবেই

বলছি, তাই তো যথেষ্ট। কালকে ভুল মনে হলে, স্বীকার করবো ভুলটাই। ক্ষতি কী!

আসলে শুধু বোধহয় আমার না। সব মানুষেরই নিজের মধ্যে একটা ফাঁকা থাকে। অবচেতনের ফাঁক। জানা অজানার মধ্যে দিয়ে কখন কীভাবে হয়তো ফাঁকাটা ভরাট হয়ে যায়। আপাত অকারণে মনটায় তখন খুশির বান ডাকে। আমার যেমন এই মুহূর্তে শুধু ভিড়ে যেতে ইচ্ছে করছে বাইরের ওই দঙ্গলে।

ঘরে বসে থাকা আরও অনেকের মুখের দিকে আলতো চোখ বুলিয়ে বন্ধুকে বলেই ফেললাম—আর কী, এবার তো বেরিয়ে পড়লেই হয়!

—তুমি বললেই হয়। গাড়ি আর ড্রাইভার তো সেই দুপুর থেকেই অপেক্ষা করছে।

বন্ধু এমনভাবে কথা বললেন যেন এই বলার অপেক্ষাটুকুতেই ছিলেন। মনে মনে আফশোস হলো একটু। চায়ের কাপ শেষ করেই মনের কথাটা বলে ফেলা উচিত ছিল। যাই হোক, এখনও সময় আছে। দিনের আলো থাকতে থাকতে অন্ততঃ বেরুনো যাবে।

কিন্তু বন্ধুর পরের কথাটি যে দিব্যি আয়াসের ইঙ্গিত। ডায়মণ্ড হারবার থেকে কাকদ্বীপ পৌঁছানর জন্য গাড়ি ও ড্রাইভারের ব্যবস্থা-যে আমাদের জন্যই, এতোটা স্বাচ্ছন্দ্য আশা করি নি। সুতরাং বাইরে বেরুবার সঙ্গেই এবার আর একটি হঠাৎ প্রাপ্তির সংযোজন। দুয়ে মিলে হলো এক আনন্দযাত্রার শুভ সূচনা। অবিশ্যি তখনও জানতাম না আপাততঃ আমাদের যাত্রাটি রমণীয় করে তোলার জন্য আরও কয়েকজন যাত্রিণী আছেন।

বাংলোতে বসেই বন্ধুর স্ত্রী তাঁর দুই বোন এবং মা'র সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই দুই বোন যে আমাদের সঙ্গে কাকদ্বীপের সঙ্গিনী হবেন, তা বুঝলাম আরও দেরীতে। বেরিয়ে এসে জীপ-এ ওঠার সময়। ড্রাইভারসহ আমরা জনাচারেক জীপ-এ উঠবো

ভেবেছিলাম ; কিন্তু এখন দেখলাম আমরা প্রায় সাতজন। আমি, আমার দ্বিতীয়জন বন্ধু (যিনি স্টেশনে গিয়েছিলেন) ড্রাইভার এই তিনজন তো আছিই। এছাড়া বন্ধুর অফিসের এক সহকর্মীও কাজকর্মেই যাবেন আমাদের সঙ্গে। এখন আরও এলেন বন্ধুর দুই শ্যালিকা এবং তার বছর সাতের পুত্র টোটা। বন্ধুর স্ত্রী যেতে পারবেন না। বাড়িতে তাঁর সাংসারিক কাজকর্ম ছাড়াও রয়েছেন কয়েকজন আত্মীয়-স্বজন।

সত্যি বলতে কী, খারাপ লাগার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। বরং আমি এক পরিপূর্ণতারই স্বাদ পাচ্ছিলাম। শুধু আমরা কয়েকটি পুরুষমানুষ পারিপার্শ্বিক, প্রকৃতি দেখতে দেখতে গল্প করতে করতে যাওয়ার থেকে সঙ্গে দুজন মহিলারও উপস্থিতি কি বেশ জমজমাট ব্যাপার না! বিশেষত ইতিমধ্যেই তারা যখন আমাদের পরিচিতা এবং খুব অল্প সময়ের জন্য হ'লেও, আলাপে আমার তাদের দুজনকেই বেশ সপ্রতিভ বলে মনে হয়েছে। তাছাড়া, অস্বীকার করতে চাই না, সঙ্গী হিসাবে কোনো যাত্রায় দুজন মহিলা থাকাটা যদি আমার দুর্বলতা বলে মনে হয়, তাহ'লে আমার সে দুর্বলতা আছে এবং আমি তাকে খুব স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত বলেই মনে করি।

এই প্রসঙ্গে অন্য একটি ছোট্ট ঘটনার উল্লেখ আশা করি পাঠকের বাহুল্য মনে হবে না। বরং কিছু বয়স্ক মানুষের একধরনের চাপা রসিক মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। সম্ভবত যা উপ-ভোগ্যও।

সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগের চাকুরি নিয়ে ঢুকেছি মেডিকেল কলেজে। কাজ প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের মেডিকেল ছাত্রছাত্রীদের এ্যানাটোমি পড়ানো। তথাকথিত শিক্ষকতা করার বাসনা আমার নেই, ছিলও না। নিজেরই অন্য প্রয়োজনে কিছুদিনের জন্য বেছে নিয়েছিলাম। ছেলেমেয়েদের পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই নিজেরও ছাত্রজীবনের এ্যানা-

টমি জ্ঞান একটু ঝালাই করে নেওয়াও ছিল এক উদ্দেশ্য।

মাস ছয় সাত পড়ানোর পরে, কীভাবে পড়ালে এবং ছবি আঁকলে ছেলেমেয়েদের শেখার সুবিধে হয়, তা আমি মোটামুটি ধরে নিতে পেরেছিলাম। বলতে ভুলে গেছি, আমি যখন পড়াতে ঢুকি, ডিপার্ট-মেন্ট-এ আমিই তখন কনিষ্ঠতম শিক্ষক এবং অন্যান্য মাস্টারমশায়রা প্রকৃতপক্ষে আমাদের সময়েরই। আমি তাঁদের "স্যার" বলি। তাঁরা আমাকে নাম ধরে ডাকেন। ছাত্রছাত্রীরা অধিকাংশ আমাকে দাদা সম্বোধন করে। আমাকে কেউ প্রচলিত রীতি অনুযায়ী "স্যার" বললে আমি অসম্ভব সঙ্কুচিত বোধ করি।

আমি হঠাৎই একদিন খেয়াল করি, আমি যে ব্যাচ পড়াই, সেই ব্যাচ-এ একটিও ছাত্রী নেই। সব ছাত্র। (মেডিকেল কলেজগুলিতে অ্যানাটমি পড়ানোর রীতি মোটামুটি জন কুড়ি বাইশ-এর গ্রুপ নিয়ে) আমি যখন সামনে ঘুরে কিছু বোঝাই পড়াই কিংবা প্রশ্ন করি, দেখি, আমার সামনে সমস্ত মুখগুলিই সদ্য যুবকের। বড় বড় চুল গোঁফ দাড়ি ঝুলপি, উঁচু সার্টের কলার···ইত্যাদি। খুব সহজ এবং স্বাভাবিকভাবেই আমার মনে হলো—কয়েকটি ছাত্রীও এর মধ্যে না থাকলে, পড়া এবং পড়ানো ব্যাপারটাই যেন বড্ড শুকনো শুকনো লাগছে। দু-চারটে মেয়েদের মুখ না থাকলে এ ঘরের পরিবেশটা ভীষণ ন্যাড়া ন্যাড়া।

আমি সেইদিনই ক্লাসের পর টিচারস্ রুম-এ গিয়ে নিঃসংকোচে সকলের সামনে মনের কথা বলে ফেললাম। সেদিন হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্টও ছিলেন।

আমি গায়ের থেকে সাদা কোট খুলে বললাম—স্যার, আপনারা আমাকে যে ব্যাচ-টা পড়াতে দিয়েছেন তাতে তো একটাও মেয়ে নেই! আমার কিন্তু স্যার ওই ছেলেদের ব্যাচ পড়াতে ইচ্ছে করে না। আপনারা কয়েকজন ছাত্রীকেও আমার ব্যাচটায় দিন।

সম্ভবত কলেজের ইতিহাসে এ ধরনের মানসিকতা ইতিপূর্বে কেউ

ব্যক্ত করে নি। সুতরাং মাস্টারমশাইরা (যাঁরা অধিকাংশই মেডিকেল শিক্ষা জগতের নামী চিকিৎসক-অধ্যাপক) প্রথমে বেশ হতভম্ব এবং পরের মুহূর্তেই সকলেই এ ধরনের আচমকা স্বীকারোক্তিতে টেবিলে শব্দ তুলে হেসে একাক্কার কাণ্ড। চা চলকে পড়ে গেল। হেড অব দ্য ডিপার্টমেণ্ট আর একজন মাষ্টারমশাইকে উদ্দেশ করে বলেই ফেললেন—আরে শুনছেন মশাই বোস-এর কথা! এ তো মারাত্মক ছেলে দেখছি!

আমি অতি সুবোধ মুখ করে বললাম—কেন স্যার, এতো খুব স্বাভাবিক। আপনারা সিনিয়াররা সব মেয়েদের পড়ান, আর আমার সামনে সব খটখটে ছেলেদের মুখ।

হাসির হল্লা পড়ে গেল আবার। আমি যত স্বাভাবিক মনের কথা বলি। ওঁদের হাসির তোড় ততো যায় বেড়ে। সে এক রীতিমত হাসাহাসির সাড়া পড়ে গেল ডিপার্টমেণ্ট-এ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট্ বললেন—ঠিক আছে। এর পরের বার গ্রুপ তৈরির সময় একটা শুধু মেয়েদের ব্যাচ তোমাকে পড়াতে দেওয়া হবে।

আমি বললাম—ঠিক আছে স্যার। আমার কোনো আপত্তি নেই।

কাজ চললো সেইভাবে। আমি বেশ আনন্দে খেটেখুটে ছাত্রীদের পড়াচ্ছি। আমি নাকি ভালো পড়াই এ ধরনের একটা গুজবও রটে গেল।

কিন্তু ক্রমশই আমি খেয়াল করলাম—অন্যান্য টিচারদের যেন পড়ানোর বিশেষ গা নেই। টিচারস রুমে বসে তাঁরা হাই তোলেন, ক্লাসে যাওয়ার সময় হয়ে গেলেও তাঁরা গড়িমসি করেন। যাচ্ছি যাবো ভাব। আমি বেশ উপভোগ করছি। কিন্তু কিচ্ছুটি বলি না। দেখা যাক, যা চলছে চলুক।

প্রায় মাস দেড়েক এরকম চলার পর একদিন আর একজন অধ্যাপক আমায় জিগ্যেস করেই ফেললেন—কি গো, কেমন পড়াচ্ছো?

—ভালো স্যার, বেশ ভালো। আমি ইচ্ছে করে একটু খেলিয়ে উত্তর দিলাম।—ভাবছি, এই অধ্যাপনার লাইনেই থেকে যাবো কি না!

—না, না এসব পড়ানোর লাইন তোমাদেব ভালো লাগবে না।—অধ্যাপক বললেন।

—কেন স্যার? আমার তো বেশ ভালই লাগছে পড়াতে।

—আহা এখন কিছুদিন সেটা মনে হচ্ছে, মেয়েদের ব্যাচ পড়াচ্ছো সেইজন্য।

আমি বললাম—আমি স্যার তাহলে শুধু মেয়েদের ব্যাচ-ই পড়িয়ে যাবো।

—অ্যাঁ, সে কী কথা! অধ্যাপক বেশ বিস্মিত এবং বিব্রত হয়েই কথার উত্তর দিলেন। টাই-এব নট্ ঠিক করে নিয়ে বললেন—না না তা কী করে হয়! একজন টিচার সব ফিমেল স্টুডেন্টদের নেবে, আর বাকীরা সব···না না তা হয় না। আমি আজই ডক্টর চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলবো···আরে দু-পাঁচটা মেয়ে না থাকলে কী আমাদেরই ভালো লাগে!

এবার আমার হাসির পালা। বললাম—তবে স্যার, আপনারা সেদিন যে এতো হাসাহাসি করেছিলেন আমি বলেছিলাম বলে! এখন আপনাদের কেমন লাগছে বুঝুন!

আবার এক দফা হাসাহাসির ঝড় উঠলো টিচারস রুমে। হেড অব দ্য ডিপার্টমেণ্ট এলেন। ঠিক হলো পরের বার থেকে প্রতিটি গ্রুপেই ছাত্রীদের সংখ্যা সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হবে।

কয়েক বছর হয়ে গেছে আমি শিক্ষকতার লাইন থেকে সরে এসেছি। মনে হয় কলেজের এ্যানাটমি ডিপার্টমেণ্ট-এ এখনও সেই নিয়মই বহাল আছে।

ফিরে যাই আগের কথায়।

বন্ধুর দুই শ্যালিকা ও তার পুত্র এবং আমি জীপের পিছনে মুখো-

মুখি দুই সীট-এ বসলাম। দ্বিতীয় বন্ধু ও তার সহকর্মী এবং আমাদের ড্রাইভার সাহেব সামনে। আগেই জেনেছি বন্ধুর শ্যালিকা-দের বড় জনের নাম কাঁকন এবং ছোটজন বাচ্চু। দুজনেই যাদবপুর য়ুনিভার্সিটির ছাত্রী। কাঁকন জিওলজিতে এম এস সি পাশ করে রিসার্চ করছে। বাচ্চু পলিটিক্যাল সায়েন্স-এ অনার্স নিয়ে পড়ছে। আমার সঙ্গে টোটা বসেছে, উল্টোদিকে পাশাপাশি দুই বোন। এক-জন লাল এবং অপরজন কালো শাল মাথার ওপর দিয়ে ঢেকে গায়ে জড়িয়ে বসেছে। হাসি খুশি ভরাট দুখানা ফর্সা মুখ শীতের এই পড়ন্ত আলোয় দেখতে বেশ লাগে।

বাঁ-হাতী চালনার জীপ ছুটে চললো ডানদিকে পাড় বাঁধানো চওড়া গঙ্গা আর বাঁ দিকে শহর ডায়মণ্ডহারবার ফেলে। সারথী হিসাবে যে মানুষটিকে পাওয়া গেছে, কয়েক মিনিটের মধ্যেই বুঝলাম সেই মনুদার হাতে আমরা সবাই যে যথেষ্ট নিরাপদ শুধু তাই নয়, তাঁর দু-একটি কথাবার্তা উক্তি ইত্যাদিতে সহজেই একটি দরাজ বন্ধুত্বেরও রেশ পাওয়া গেল। দিব্যি খোলামেলা মানুষ, গল্প করতে পারেন। একটা সিগ্রেট বাড়িয়ে দিলাম। কথা প্রসঙ্গে মনুদা জানালেন, এই জীপ গাড়িটি তাঁর ছেলের বয়সী। আঠাবো কুড়ি বছর গাড়িটি তাঁর হাতে।

—তাই নাকি ? আমি বললাম।—আপনি তো প্রায় একটি রেকর্ড করতে চলেছেন।

হাঃ হাঃ করে হাসলেন মনুদা।—এর নাড়ি নক্ষত্র আমার জানা। মনুদা বললেন—এর এদিক ওদিক একটা অন্যরকম আওয়াজ হলেই আমি গোলমালটা ধরে ফেলি।

সামনের সীট থেকে বন্ধু এই সময়ে মনুদার অলক্ষ্যে আমার কানের কাছে মুখ বাড়িয়ে নিয়ে এলেন। ফিসফিস করে বললেন—এই জীপটার ব্যাপারে মনুদা খুব ইমোশনাল। ওঁর আঠারো উনিশ বছরের ছেলেটি দুবছর আগে এনকেফালাইটিস-এ মারা গেছে।

বন্ধু আবার ঘাড় ঘুরিয়ে সোজা হলেন। মনুদার গলা পেলাম—তবে আমার এ গাড়ি খুব মুডি। একবার স্টার্ট নেবো না কিংবা চলবো না মনে করলে, কারো সাধ্য নেই চালাবার।

একটু থেমে আবার বললেন—অবশ্য আমার কাছে থাকলে আলাদা। দু সেকেণ্ডে আমি ওকে চাঙ্গা করে তুলি। আপনার বন্ধুকে বলে রেখেছি—স্যার, এ গাড়িকে যেদিন বাতিল করবেন, সেদিন থেকে আমার ছুটি। অন্য গাড়ি আমি আর চালাতে পারবো না।

কথা বলতে পারছি না কিছু। কী অদ্ভুত শর্ত। অনুভূতিহীন লোহা লক্কড়ের গাড়ি একখানা, একটি মানুষের পুত্রস্নেহের ভাগ পেয়েছে। কী বিচিত্র মানুষের মন!

রাস্তার নাম কাকদ্বীপ রোড। যদিও গাড়ি একটি অভিজ্ঞ বলিষ্ঠ হাতের নিয়ন্ত্রণে, তবু মাঝে মধ্যেই খানাখন্দে পড়ে যা লাফাচ্ছে যে শক্ত করে ধরে না বসলে যে কোনো মুহূর্তেই ছিটকে বাইরে চলে যেতে পারি। তার উপর উল্টো দিক থেকে একটু পরে পরেই ফাঁকা বাস কিংবা লরি ছুটে আসছে উন্মত্ত বেগে এবং কানের পর্দা ফাটানো হর্ন বাজিয়ে। এদের নৃশংস গতিবিধি আর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে অবাধে মানুষ পশু খুন করার পারমিট এদের দেওয়া আছে। অবশ্য শহর কলকাতার রাস্তাতেও এ অতি পরিচিত দৃশ্য। মানুষের জীবন পকেটে ভরে, আইনকানুন রাজনীতি দিয়ে এরা মুনাফা লোটে। আমি সত্যি সত্যি সেইদিনের অপেক্ষায় আছি, যখন এই সমস্ত রক্ত-চক্ষু জঙ্গী হত্যাকারীর বিরুদ্ধে সকল স্তরের মানুষের হাতে চাবুক লকলকিয়ে উঠবে। আমি সেই কানুনকে স্বাগত জনোনোর প্রতীক্ষায় আছি—যে কানুন কানের পর্দা ফাটানো ইলেকট্রিক হর্ণ বাজানো-মাত্র সেই গাড়ির লাইসেন্স বাতিল করবে।

টুকটাক কথা চলছিল এইসব নিয়ে কাঁকন আর বাচ্চুর সঙ্গেও। সম্প্রতি ওদের ইউনিভার্সিটিতে শব্দ নিয়ন্ত্রণের ওপর নাকি একটি সেমিনার হয়েছে। হঠাৎ ছোট বোন বাচ্চু জিগ্যেস করলো—আচ্ছা

আপনি অমিতাভদাকে চেনেন ?

একটু আনমনা হয়েছিলাম আমি। মুহূর্তে সচেতন হয়ে বললাম —অমিতাভ ? কে, কোন অমিতাভ বলো তো ?

—আপনাদের সঙ্গে পাশ করেছে। লেক টেরেসের কাছে বাড়ি।

—ওহ্ হো, অমিতাভ মানে অমিতাভ গুহ ? ডাক নাম বুড়ো ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, চেনেন ?

লক্ষ্য করছি বাচ্চু যতো উৎসাহিত হয়ে অমিতাভর কথা জিগ্যেস করছে, ওর দিদি কাঁকন যেন ততোই একদিকে গুটিয়ে যাচ্ছে আর একদিকে কৌতূহলী হয়ে উঠছে।

বললাম—চিনি মানে! খুব ভালোভাবেই চিনি। তোমরা চেনো নাকি ওকে ?

বাচ্চুই উত্তর দিলো।—আমি চিনি না। একটু থেমে বাচ্চু হেসে চোখ ঘুরিয়ে দিদির দিকে তাকিয়ে বললো—ওই যে ওর চেনা। আমি দু একবার দেখেছি।

দেখতে পাচ্ছি কাঁকনের চোখমুখে একই সঙ্গে আনন্দ আর লজ্জার আনাগোনা। সেই সঙ্গে একটু চাপা কৃত্রিম কোপে বোনকে বকুনিও।

—যাহ্, চুপ করতো।

—অমিতাভদা তো এখনও ইংল্যান্ডে রয়েছে।—এম আর সি পি করছে।

—জানি। সংক্ষিপ্ত উত্তরটা দিয়ে চুপ করে যেতে চাইলাম। কাঁকনের সঙ্গে আমাদের বুড়োর সম্পর্কটা কেমন ইতিমধ্যে আমি তা অনুমান করে নিতে পেরেছি। সূক্ষ্মভাবে মনে হচ্ছে, অতীতে কখনও আমি কাঁকনকে বুড়োর সঙ্গে দেখেও থাকতে পারি। কিন্তু…

—আপনি তো মাসখানেক কী মাস দেড়েক আগে দেশে ফিরেছেন তাই না ?—বাচ্চু জিগ্যেস করলো।

—হ্যাঁ। বুড়োর সঙ্গে আমার দেখাও হয়েছে ওদেশে।—কথাটা বলে ফেলেই বুঝলাম ভুল করে ফেলেছি।

—দেখা হয়েছে আপনার সঙ্গে ? বাচ্চু নয়, এবারের আকুল প্রশ্নটি বেরিয়েছে কাঁকনের মুখ থেকে। এবং পরমুহূর্তেই আবার প্রশ্ন —কোথায়, কোথায় দেখা হলো আপনার ওর সঙ্গে ? ও এখন কোন হসপিটালে আছে ?

একমাত্র আমার সঙ্গে দেখা হওয়া ছাড়া কাঁকনের বাকী প্রশ্নগুলোর উত্তর তো আমিও জানি না। এমন কী বুড়োর পক্ষে আর কোনোদিন ওদেশ ছেড়ে আসা সম্ভব কী না, তাও আমি জানি না।

মনে মনে উত্তরটা খুব সাবধানে সাজিয়ে বললাম—আমার সঙ্গে বুড়োর চলে আসার কিছুদিন আগেই দেখা। ও আমার বাড়িতে এসেছিল। ওয়ালসল্-এ। ছিল তিনদিন। ও বোধহয় সেই সময় একটা চাকরি শেষ করে আর একটা খুঁজছিল।

কাঁকন একইরকম গলায় বললো—পেয়েছে চাকরি ?

—ঠিক জানি না। আড়চোখে কাঁকনের মুখের দিকে তাকালাম। মনে হলো নানা রকম উদ্বেগ দুশ্চিন্তা একই সঙ্গে ওর মুখে জমা হয়েছে। অনেক কিছু শোনার প্রত্যাশা নিয়ে বোধহয় আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। বললাম—আসলে আমি তো তারপরে আর ওদেশে ছিলাম না। বুড়ো চলে যাওয়ার দু'দিন পরেই আমি কণ্টিনেণ্ট্ চলে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে মাত্র চারদিন ইংল্যাণ্ড-এ ছিলাম। তারপরেই দেশে চলে আসি। ওর সঙ্গে আর দেখাও হয় নি।

—ওহ্, আচ্ছা।—খুব আস্তে বললো কাঁকন। তারপর আবার বললো—তিন মাসের ওপর আমি ওর কোনো চিঠিপত্র পাই না।

—কাঁকন চুপ করে গেল।

—ব্যাস্, এবার তাহলে আবার লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদো।—বাচ্চু ঠাট্টা করলো দিদিকে।

কাঁকন গম্ভীর হয়ে বললো—তুই চুপ কর তো!

আমি ইচ্ছে করেই বুড়ো প্রসঙ্গে আর কোনো কথা বলছি না, এটুকু

বুঝেই কী না জানি না, কাঁকন আর বিশেষ প্রশ্ন করলো না। ভালই করেছে। কেন না, যেটুকু ইতিমধ্যে আমি জানতে পেরেছি, মন তাতেই আমার যথেষ্ট ভার হ'য়ে গেছে। কাঁকনের জন্য এক ধরনের চাপা কষ্ট আমার ভিতরেই পাক খেয়ে চলেছে।

বুড়োর যে অবস্থা ও জীবন যাপন বিলেতে আমি দেখে জেনে এসেছি, তাতে এটুকু আমি নিশ্চিত, কাঁকনের মতো মেয়ে যে সুখী ভবিষ্যতের আশায় দিন গুণছে, তা আর সম্ভব নয়। জানি না কাঁকন তা আঁচ করতে পারছে কী না। যদি পারে এবং পেরে অন্য-রকম ভাবে নিজের ভবিষ্যত সম্বন্ধে ভাবে, তাহলেই ভালো। কেন না, বুড়ো ওদেশের অনেক মেয়ের সঙ্গে ঘুরে, শেষ পর্যন্ত রুথ বলে একটি নার্সকে সম্ভবত এতোদিনে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে। রুথ্‌কে আমি বুড়োর সঙ্গেই দেখেছি স্বামী স্ত্রীর মতন থাকতে। আমার সঙ্গে আলাপ এবং কথাবার্তাতেও বুঝেছি, রুথ বুড়োকে সহজে ছাড়বার পাত্রী নয়। হায়, তখনও আমি কাঁকনের কথা জান-তাম না। তাহলে একবার অন্ততঃ শেষ চেষ্টা করতাম।

মনটা বড় দমে গেল। অথচ এক্ষেত্রে আমার ভূমিকার কোনো গুরুত্ব নেই। কাঁকন নিজেও জানবে না, ওর জীবনের অনিশ্চয়তা আপাতত মোচড় দেওয়া ব্যথা হয়ে আমার বুকেই বাজছে।

কাকদ্বীপের কাছাকাছি এসে পড়েছি। মাঝপথে গোটা কয়েক চেক-পোস্ট পড়েছিল। শুনলাম সেখানকার কর্মকর্তাদের মূলতঃ দুটি দায়িত্ব। এক, কোনো গাড়িতেই সরকার নির্ধারিত সংখ্যার অধিক যাত্রী নেওয়া হচ্ছে কিনা দেখা এবং দুই—প্রতিটি যাত্রীর সঙ্গে কলেরা প্রতিষেধকের সার্টিফিকেট আছে কিনা পরীক্ষা করা।

প্রশংসনীয় ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে। কিন্তু বজ্র আঁটুনি গানেই যে ফস্কা গেরো, এ তত্ত্ব আমাদের চেয়ে ভালো আর কে জানে! চোখের সামনে দেখতেও পেলাম।

বাসে চলেছে বাদুড় ঝোলা মানুষ। চেকপোস্ট্‌-এর মাত্র কয়েক গজ

দূরে অতিরিক্ত যাত্রীদের নামানো হচ্ছে। তাঁরা হাঁটা পথের যাত্রীদের মতো গেট পেরিয়ে চলে আসছেন। আড়াআড়ি পাতা বাঁশের গেট দিয়ে বাস বেরিয়ে যাচ্ছে, আবার একটু গিয়ে থেমে, অতিরিক্ত যাত্রীদের ভরে নিচ্ছে খোলের মধ্যে। এই সময়টুকুর মধ্যেই কণ্ডাক্টর অবশ্য দ্রুত ঢুকে যাচ্ছেন চেকপোস্ট্-এর গুমটি ঘরে। হাতে তাঁর নোট ঠিক করাই আছে। হিসেবনিকেশটা কয়েক সেকেণ্ডে সেরেই চলে আসছেন।

দিব্যি সুন্দর একটি নলচে আড়াল পদ্ধতি! পরিভাষায় একে ওপেন সিক্রেট-ও বলা ঠিক হবে না। তাতে সিক্রেট শব্দটির অপব্যাখ্যা করা হয়। বোধহয় ওপেন এ্যাফেয়ার বলাই ঠিক। আমাদের ভারতবর্ষের মতন আশি কোটি লোকের দেশে এসব কড়া (!) বিধিনিষেধের দরকারটা কী! কিছু লোকের হাতে টাকা পাইয়ে দেবার পবিত্র কর্তব্য!

অবশ্য সেইসঙ্গেই বলি, জবরদস্ত কিছু কড়াকড়ি সত্যি করা হয়েছে কলেরা প্রতিষেধকের ক্ষেত্রে। মাঝপথে একবার নেমেছিলাম। সুঁই না ঢুকিয়ে কোনো আদমীকেই রেহাই দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু ইঞ্জেকশন দেওয়ার সেই ঘরের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে যা দেখলাম, মনে হলো সে আর এক ফাঁড়া।

ষ্টেরিলাইজেশনের কোনো ব্যাপার নেই। "ধর তক্তা, মার পেরেক" এর মতো সিরিঞ্জ-এ ভরা প্রতিষেধক, একটি প্রায় গুণছুঁচের মতো নিড্‌ল দিয়ে ধারাবাহিক ফুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে। একবার ওষুধ নিয়ে পাঁচ সাত জনকে। সেইসঙ্গে দুম্ করে একটি ষ্ট্যাম্প্ এবং হিজিবিজি সই ওয়ালা একখানি চোতা কাগজ।

মনে মনে ভাবলাম, কলেরার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে কেউ যদি সিফিলিস্-এ আক্রান্ত হন ভবিষ্যতে, তার দায় কার!

অন্ধকার নেমেছে ঘন হ'য়ে। রাস্তার ধারে কাছে অবশ্য তা বোঝার উপায় নেই। পর্যাপ্ত মার্কারি আর ফ্লুরেসেণ্ট আলোর ব্যবস্থা

হয়েছে। গাড়ি বড় রাস্তা থেকে ডান দিকে বাঁক নিল। উদ্দেশ্য হারউড পয়েন্ট্-এর দিকে যাওয়া, যেখানে উপ-জেলাশসক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা। পয়েন্ট শব্দটি আপাতত ঘাট-এর প্রতিশব্দ। স্বীকৃত যেসব জায়গা দিয়ে যাত্রী পারাপার করা হচ্ছে সেগুলোই এক একটি পয়েন্ট। আঘাটা দিয়েও পারাপার হচ্ছে না তা নয়, তবে প্রবণতা বেশি ঠিক জায়গা দিয়েই গিয়ে লঞ্চ্ ধরার।

জীপ থেকে নেমে পড়লাম। এতোক্ষণ ভিতরে চাদর গায়ে দিয়ে থাকায় বুঝতে পারিনি বাইরের বাতাসে ঠাণ্ডা কতখানি। নেমেই বুঝতে পারলাম শরীরের প্রতিটি খোলা জায়গাই আলাদাভাবে ঠাণ্ডা টের পাচ্ছে। মাথা গলা সব ঢেকে নিয়ে এগিয়ে চললাম। ভেবেছিলাম, আমরা প্রত্যেকেই নেমেছি। কিন্তু একটু এগিয়ে এসেই বুঝলাম একজন আমাদের মধ্যে অনুপস্থিত। কাঁকন। সারথী মনুদা জানালেন—কাঁকনদি কিছুতেই নামতে চাইলেন না। বললেন, আমরা তো ফিরেই যাবো। আমি বসছি, আপনারা ঘুরে আসুন।

কাঁকনের এই প্রতিক্রিয়া সম্ভবত খুব স্বাভাবিক। কিন্তু এ তো সম্পূর্ণভাবেই তার ব্যক্তিগত জীবনের দায়।

সামনে এসে দেখি এক বিরাট কর্মকাণ্ড। শহর কাকদ্বীপ থেকে হারউড পয়েন্ট প্রায় মাইল দুয়েক। গঙ্গার পাড়ে এক বিশাল এলাকা নিয়ে এই অস্থায়ী প্রায় বন্দরটি তৈরি হয়েছে। কাকদ্বীপ হয়ে যাঁরা যাচ্ছেন, তাঁদের স্থলপথ শেষ হয়ে এখান থেকেই জলপথ যাত্রার শুরু। সুতরাং লক্ষ লক্ষ যাত্রীকে তাঁদের মালপত্রসহ পূর্ণ নিরাপত্তায় যাতে নদী পার করা যায় তার আনুষঙ্গিক সব ব্যবস্থাই করা হয়েছে।

একসঙ্গে অন্তত ত্রিশটি বাস দাঁড়াতে পারে এবং ঘুরে বেরিয়ে যেতে পারে এইরকম একটি টার্মিনাস। দু এক মিনিট অন্তর একটি করে বাস আসছে। পিল পিল করে তার থেকে নামছেন যাত্রীরা। পুলিশ আর স্বেচ্ছাসেবকদের নির্দেশে যাচ্ছেন লঞ্চ্-এর টিকিট কাটার

লাইনে। টিকিট নিয়ে আবার দাঁড়াচ্ছেন পাশাপাশি তৈরি করা অনেকগুলো কাঠের পুল-এর যেকোনো একটিতে। পর্যায়ক্রমে সেখানে লঞ্চ এসেই চলেছে। বিরাম নেই যাত্রী পারাপারেরও। আরও অনেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও করা হয়েছে। পানীয় জল, মাইক-এ নির্দেশ, অজস্র আলো, প্রাকৃতিক ক্রিয়াদির জায়গা, একটি ছোট হাসপাতাল, সরকারি বেসরকারি কর্মীদের থাকার ক্ষণস্থায়ী আবাস ইত্যাদি। টেলিফোনের ব্যবস্থা, এ্যাম্বুলেন্স্ এবং দমকলের গাড়িরও বন্দোবস্ত রয়েছে। চতুষ্পার্শে অঢেল ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো।

সমস্ত ব্যবস্থাটির সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য স্বয়ং জেলাশাসক তাঁর বিভিন্ন সহকারীদের নিয়ে নাওয়া খাওয়া ছেড়ে কাজ করে চলেছেন। সত্যি বলতে কী, তাদের কাজ এবং নিষ্ঠা দেখে সরকারী কর্মচারীদের এক অংশ সম্পর্কে ধারণা পালটে যায়। আমাদের মহাকরণের ঐতিহাসিক সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে যাঁদের কখনও কোনো ব্যাপারে যোগাযোগ কিংবা প্রয়োজন হয়েছে, তাঁদের নিশ্চয়ই ধারণা আছে, কী কঠিন ভূমিকা তাঁদের অধিকাংশের। হারউড পয়েণ্ট-এর সরকারী লোকজন দেখে মনে হচ্ছিল, এ ধরনের কিছু লোক অবশিষ্ট আছে বলে এখনও সরকারী কাজকর্ম তবু হয়।

বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো। কাজকর্ম দায়িত্ব ব্যস্ততায় যথেষ্ট জড়িত থাকা সত্ত্বেও তার ব্যক্তি মানসের সাময়িক নিষ্কৃতির প্রয়োজনও নিশ্চয়ই আছে। এক্ষেত্রে তার পদমর্যাদাও গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের পৌঁছানব কথা তার জানা আছে। সেই অনুযায়ী একটি ছোট ব্যবস্থাও করা আছে।

বন্ধুর ব্যক্তিগত পরিদর্শনের জন্য লঞ্চ্ ওপারে কচুবেড়িয়া যাবে। সুতরাং সহযাত্রী হ'তে বাধা কোথায়!

উঠে পড়লাম লঞ্চ্-এ। আমার ইতিপূর্বে জীপ-এর সহযাত্রী এবং যাত্রিনীরা ফিরে গেছেন, একমাত্র দ্বিতীয় বন্ধু ছাড়া। অবশ্য লঞ্চ্-এ আপাতত দেখতে পাচ্ছি আমরা কজন ছাড়াও বেশ কয়েকজন

স্থানীয় পুরুষ ও মহিলা কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবক । সরকারী কর্মচারী কয়েকজনের কিছু আত্মীয়স্বজন মনে হলো নিরুপদ্রব এই সুযোগটির অপব্যবহার করলেন না । আস্তে আস্তে ডেক্-এর উপর উঠে এলেন কিছু মহিলা ও পুরুষ ।

বেশ ভালই । রাতের অন্ধকারে গঙ্গাবক্ষে একটি ছোট্ট বিহার । মন্দ কী ! আমার তো খারাপ লাগার কোনো ব্যাপারই নেই । বাইরে বেরুলেই ভালো লাগার কাজল অজান্তেই কে যেন আমায় পরিয়ে দেয় ।

বন্ধু যেন অনেকক্ষণ থেকেই হাঁফ ছাড়ার এই প্রত্যাশাটুকুতে ছিলেন । ডেকের উপর শতরঞ্চি পেতে চাদর জড়িয়ে বসলাম । গল্প, কথা-বার্তার মধ্যেই দেখলাম লঞ্চ্ ছাড়ার আগের মুহূর্তে একজন তিন কাপ চা-ও দিয়ে গেলেন হাতে ।

ভুট ভুট শব্দে লঞ্চ্ ছেড়ে দিলো । চাঁদবিহীন তারাভরা ঝকঝকে আকাশ । জোয়ার আসতে দেরি আছে । ভাঁটার নদীতে তিরতিরে স্রোত । কালো রাত্রির উন্মুক্ত প্রকৃতিতে অবারিত শীতের বাতাস ছুটছে নদীর ওপর দিয়ে । শব্দ উধাও হয়ে যাচ্ছে হাওয়ার গতিতে । পরিবেশে নেশার আমেজ । মুখের কথা এসময় থেমে গিয়ে নিঃশব্দে কী এক আলোড়ন তোলে বুকের গভীরে । জল কাটার ঝিম ধরানো চাপা গম্ভীর গর্জন, ছোট ছোট ঢেউ-এর দুলুনি আর ছুটন্ত ফাঁকা বাতাসের মেশামিশিতে দ্রুত একটি মোহাচ্ছন্ন পরিবেশ তৈরি হয়ে গেল ।

শুনতে পাচ্ছি মহিলারা গুনগুনিয়ে উঠেছেন অবধারিত "নদী আপন বেগে পাগল পারা ।"

জানি না কিভাবে সুর বেজে উঠেছে আমার গলাতেও । "…কূল নাই সীমা নাই অথৈ দরিয়ার পানি…" ।

গঙ্গা (বড়তলা নদী) বিশাল চওড়া এখানে । পার হ'তে লাগলো

চল্লিশ মিনিট। স্বয়ং উপ-জেলাশাসকমশাই এসেছেন। সুতরাং নামা ওঠার ব্যবস্থা পৃথক। যাত্রী সাধারণের পারাপারের কিছু তফাতে শাল খুঁটির ওপব তক্তা পেতে একটি ছোট পুল তৈরি করা হয়েছে। সম্ভবত সেটি ভি আই পি ঘাট। পাকেচক্রে একদিনের নবাবী করে আমরাও সেই ঘাটেই নামলাম।

নেমে আসতে আসতেই ভাবছিলাম, অনেক জায়গারই নামমাহাত্ম্য থাকে। কচুবেড়িয়া জায়গাটির নামের উৎস কী! মনে মনে নিজেই ধরে নিলাম, হয়তো একসময় কচুবন দিয়ে ঘেরা ছিল এলাকাটি। কিন্তু এখন তো একটু এগিয়ে এসে চোখের সামনে যা দেখতে পাচ্ছি তা যে এক কূলবিহীন মানবসমুদ্র। ইতিপূর্বে হারউড পয়েণ্টেই জনসমাগম দেখে খানিকটা বিস্মিত হয়েছিলাম। কিন্তু এখন যা দেখতে পাচ্ছি একে সমুদ্র ছাড়া আর কী বলা যায়! তবু শুনলাম এ যা দেখছি প্রকৃতপক্ষে গঙ্গাসাগর মেলার সামগ্রিক জনসমাগমের এ এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র।

যতো যাত্রী এখানে পেঁছেছেন তাঁদের সকলেরই লক্ষ্য এবং অপেক্ষা বাসে ওঠার জন্য। কিন্তু দূর দূরান্ত থেকে আগত বহু যাত্রীই তাঁদের কয়েকদিনের পরিশ্রম এবং ধকলে এতো বেশি ক্লান্ত অবসন্ন যে তাঁদের আর মাইলব্যাপী লাইনে দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই। তাঁরা যে যেখানে পেরেছেন ঘাস বিচুলি কিংবা হোগলার ওপর সঙ্গে আনা কাঁথাখানি বিছিয়ে বসে অথবা শুয়ে পড়েছেন। আমাদের পা ফেলতে হচ্ছে সাবধানে, দেখে শুনে। নয়তো অজান্তে কারো গায়ে পা প'ড়ে যাওয়া বিচিত্র নয়।

বাস এসে চলেছে একটির পর একটি। কিন্তু মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে তাতে তিল ধারণের জায়গা থাকছে না। সাগরযাত্রী জনসিন্ধুর কাছে এক একটি বাস সত্যি বিন্দুসম। দৈনিক যেখানে মোটে তিন-চার খানা বাস যাতায়াত করে, আপাতত সেখানে চুয়ান্নটি বাস শুধু সরকারী উদ্যোগেই যাতায়াত করছে। এছাড়া চলছে ভ্যান, কাঠের

পাটাতন পাতা খোলা সাইকেল রিক্সা। সাকুল্যে পাঁচজন যাত্রী তাতে চাপতে পারে।

ছড়ানো ছিটানো হাজার হাজার সংক্ষিপ্ত অথবা বিস্তৃত রীতিমত সংসার পাতা হয়েগেছে। তার মধ্যেই ব্যাঙের ছাতার মতন গজিয়েছে অসংখ্য চা মুড়ি জিলিপি তেলেভাজা খাবারের দোকান। হারউড পয়েন্ট-এর তুলনায় বিজলীবাতি কম। হারিকেন মোমবাতি কেরোসিন আর কার্বাইডের লম্ফ জ্বলছে শয়ে শয়ে। তার থেকে উঠছে ধোঁয়া, মিশছে রাস্তার শুকনো ধুলোর সঙ্গে। এক অদ্ভুত ঝাপসা আলো আঁধারি ভাব অথচ মুখর। হাজার হাজার মানুষের নানা ধরনের মুখের চেহারা। কেউ ভৌতিক কেউ কিম্ভুত। বাস কণ্ডাকটরদের চিৎকার ডাকাডাকি মিলিয়ে হট্টগোল। মুহূর্তে আপনজন হারিয়ে যাওয়ার আশংকা। তার মধ্যেই চলেছে হাসি গল্প ভাত রান্না ফেন গালা খাওয়া মুখ ধোওয়া বাসনমাজা বুক খুলে শিশুকে স্তন্যপান করানো হামানদিস্তেয় পান ছ্যাঁচা। সামান্য আড়ালের সান্ত্বনার মধ্যে দ্রুত প্রাকৃতিক কাজ সেরে নেওয়া। কোনো অসুবিধা নেই। ঘর গেরস্থালির যাবতীয় কাজকর্ম এই খোলা উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে হাজার জনের মধ্যে দিব্যি চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এই সহবস্থানে যেন সংকোচের ব্যাপার কিছু নেই। উত্তুরে হাওয়া আসছে, ঠাণ্ডার কনকনানি বাড়ছে।

জানি না দূর থেকে দেখলে আপাতত এই কচুবেড়িয়াকে একটি অদ্ভুত দ্বীপ মনে হবে কী না, যেখানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আলোর শিখায় দেখা যাবে হাজার হাজার মানুষের নড়াচড়া, যানবাহনের গতিবিধি, শোনা যাবে কী না বহুজনের মিশ্রিত কণ্ঠস্বরের কোলাহল।

আগামীকাল বিকেল পর্যন্ত চলবে এই অবিশ্রান্ত টানাপোড়েন। লঞ্চ নৌকা বাস ভ্যান সবই সারারাত্রি সচল থাকবে। এখন যাঁরা কাঁথা কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছেন ভোর রাতের দিকে তাঁদের বাসের

লাইনে দাঁড়ানোর বাসনা। কিন্তু এখনই যে গিজগিজে ভিড়ের লাইন দেখছি তার শেষ কোথায় জানি না। মাঝে মধ্যেই এক একটা জায়গায় গোলমাল এবং ধস্তধস্তি লেগে যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে না লাইন এগুচ্ছে নাকি! এই মুহূর্তের শেষ যাত্রীটি আগামীকাল ভোরেও বাসে ওঠার সুযোগ পাবেন কিনা কে জানে!

এক অদ্ভুত শিহরনের কাঁটা উঠছিল আমার গায়ে। এক সঙ্গে এতো মানুষ এবং তাদের খোলামেলা সংসার ও জীবন যাপনের এমন বিচিত্র চেহারা আমি আগে দেখিনি। এই ধূলি ধূসরিত হিম পড়া ঠাণ্ডা মাঠের মধ্যে বিভিন্ন ভাষাভাষী কয়েক লক্ষ মানুষের অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিক রাত্রি যাপন কি করে সম্ভব আমি ভাবতে পারি না। জানতে ইচ্ছে করে, এই অসম্ভব কষ্ট স্বীকার এবং শারীরিক নির্যাতন সহ্যের পিছনে এই অগুনতি জনমানসের প্রকৃতপক্ষে যে আনন্দানুভূতি রয়েছে তার প্রকৃতি ও রূপ কেমন। কিসের সন্ধান করতে এসেছে এই জন সমুদ্র! এরাই কী সেই ভারতবাসী যাঁরা রাজনীতি করে, যাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, যারা বন্যার পরে গাছের মাথায় আশ্রয় নেয়, যারা প্রধানমন্ত্রীর হাতে গোলাপ দেয়! কী পায় এরা এই খরচ ঝুঁকি আর এই পরিশ্রান্ত সফরের শেষে! পুণ্য অর্জন? স্বর্গপ্রাপ্তির গ্যারাণ্টি!

আমার নিজের কোনো তীর্থবোধ গড়ে ওঠে নি। সেই অর্থে আমি তীর্থযাত্রীও নই। সত্যি তো এই অমানুষিক কষ্টস্বীকারের দায়ও পারিনি নিতে। কেন জানিনা মুহূর্তের মধ্যে এক বিদ্যুৎ তরঙ্গের ঝিলিক অনুভব করি মাথার মধ্যে।

আমিই বা কেন এখানে!

এমন শীতের সন্ধ্যায় তো আরও অনেক কিছু করার ছিল, অনেক জায়গায় যাওয়ার ছিল। হাফ প্যাণ্ট পরে ব্যাডমিন্টন খেলতে পারতাম। হোটেল রেস্তোরাঁ ক্লাবে অনেক বন্ধু পাওয়া যেতো। কিন্তু কী এক খেয়ালে সে সব কিছুই না করে খানিকটা যেন আচ্ছন্নের

মতোই এক ডগমগ আনন্দের ঘোরে বেরিয়ে পড়েছিলাম। পিছুটান ছিল, হাজারটা ঝঞ্ঝাট ছিল, ভ্রূ কোঁচকান বাঁকা চোখের তাকানো ছিল। তা সত্ত্বেও এমন খেয়াল হয় কেন! যদি বা এক অদ্ভুত খেয়াল তাহলে আনন্দ এসে মেশে কী করে!

বড় জটিল এসব ভাবনা চিন্তা। কিন্তু তার থেকেও বিচিত্র এমনই এক পরিবেশে হঠাৎ এসব দার্শনিক ভাবনাচিন্তা আমার মাথায় আসা। মনে হয় এই অসংখ্য অগুনতি মানুষের মেলা যেন একটি আয়নার মতো আমার সামনে। অস্বচ্ছ ঝাপসা আমার একটা চেহারাও যেন তার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। চিনতে পারছি অথচ বুঝতে পারছি না। নিজের সঙ্গে নিজের এও এক বিচিত্র খেলা। ধুলো মাটিতে পা আটকে গেছে। সুষুম্নাকাণ্ডের অভ্যন্তরে কী এক প্রবাহ, শ্বাস প্রশ্বাস অনিয়মিত পড়ছে। কাছেই অসম্ভব একটা গোলমাল চলছে। বুঝতে পারলাম কোনো একটি বাসের সামনের চাকা বসে গেছে এবং তার সামনেই আবার একটি খাবারের দোকানের উনুন ধ্বসে পড়েছে। স্বেচ্ছাসেবক পুলিশ হোমগার্ড এবং যাত্রীরা মিলে সেখানে এক সাংঘাতিক উত্তেজনা। আর তার মধ্যেই আমার গায়ে কাঁটা, হাউই তুবড়ি জ্বলছে ফাটছে মাথার মধ্যে। থর থর করে কেঁপে উঠছি আপনা-আপনি এক বিস্মিত উন্মাদনায়। হঠাৎ এক্ষুণি আমি কিছু একটা করে ফেলতে পারি। নাহ্, কিছুই করতে হলো না।

কিছু ভাবা কিংবা বোঝার আগেই মুহূর্তের মধ্যে একটি আকস্মিক ঘটনায় একেবারে ভোম্বল হয়ে গেলাম। হাজারটা চিৎকারের মধ্যে একটি শিশুর চিলকণ্ঠ ধেয়ে এলো কানের পাশে।

—ও কাকু, কাকু গো—।

কান্না জড়ানো দিশেহারা তীক্ষ্ন আতংকিত একটি শিশুর কণ্ঠস্বর। ঝনঝন শব্দে কাঁচের বাসন কানের পাশে ভেঙে পড়ার মতো। কিন্তু তখনও জানতাম না শিশুটির ওই ডাক এবং কান্নার লক্ষ্য এই

অধীন। চমকে মুখ ঘুরিয়ে দেখতে যাবো, সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে পিঠের কাছে দাঁড়ানো এক মাঝবয়সী গ্রাম্য মহিলার কোল থেকে ছিটকে আসা দুটি রোগা রোগা কচি শিশু হাত একেবারে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরলো আমার গলা। গায়ে আমার বিচুলি রং-এর একটি চাদর জড়ানো ছিল। কিছু বলা কিংবা বুঝে ওঠার আগেই শিশুটি তার মুখের লালা নাকের শিক্নি এবং জলে ভেজা চোখের ধ্যাবড়ানো কাজল আমার চাদরে ঘষে মুছে, এইরকম গলায় আবার কেঁদে বলে উঠলো—ও কাকু, আমায় বাড়ি নিয়ে চলো। এখানে আমি থাকবো না—আ—আ—।

কী অকল্পনীয় অবস্থা আমার! ব্যোমকে বেঁকে গেছি। বাচ্চাটি কোলের ওপর গলা জাপটে ধরে ঝুলছে, খেজুর গাছে কেঁড়ের মতন। সেই সঙ্গে ডাক ছাড়ছে। আমি এদিক ওদিক তাকাচ্ছি। কেউ পাত্তা দিচ্ছে না। ব্যস্ত যাত্রীরা ভিড়ের ঠেলায় আর গোলমালে মত্ত।

এর মধ্যেই বাচ্চাটির সঙ্গে আসা সেই মহিলা বাচ্চাটিকে ধরে টানা-টানি শুরু করেছেন। সঙ্গে তিনি নিজেও রীতিমতো চিৎকার করে পাগলামি এবং কান্নাকাটি জুড়েছেন।

—ওরে হারামজাদা মুখপোড়া, কাকে ধরতে কার কোলে উটিচিস, সে ভন্দুরে কুত্তা মিনসে কি আর এ তল্লাটে আছে?

বিহ্বল হতভম্ব নার্ভাস আমি। তবু হালে পানি পাওয়ার মতো এই ত্রিশঙ্কু অবস্থার মধ্যেও এবার আন্দাজ করলাম—যাক্ আমি তাহলে একটি ভুলের শিকার। এবং একটি সোচ্চারিত কণ্ঠে তা প্রমাণিতও। কিন্তু তা বললে কী হবে! মুহূর্তে ভিড় আমাদের ছেঁকে ধরেছে। ঠেলাঠেলিতে দাঁড়াতে পারছি না।

তার মধ্যেই এই আকস্মিক ব্যাপারটুকু যা জানতে পারলাম, মহিলার ভাষায়ঃ

"খোকা আমার জন্ম-ন্যাংড়া, বাবা। রোগা লিকলিগে পায়ে এই পাঁচ

বছরেও আর দাঁড়াতে শিখলো না। জলপড়া কোবরেজী হোমেপাথি সব করা হয়ে গেছে, এইবার শেষ ভরসায় যাচ্ছিলাম সাগরে। তা আর আমার হলো না। নারাণপুর থেকে নিয়ে এয়েচে দেওর কিন্তু সে মেনিমুখো ঢ্যামনা নিশ্চয় আমাদের ফেলে রেখে কোনো ছুঁড়ির পেছু পেছু পাইলে গ্যাচে। অনেকক্ষণ ধরেই সে মতলব কষছে। ওগো, আমি এখন কোতায় যাবো-ও-ও··· ।"

মাটিতে বসে পড়ে হাত পা ছুঁড়ে হাঁউমাউ করে কান্না জুড়লেন মহিলা।

কিন্তু ডাক ছেড়ে কান্নার সময় যে এখন আমারও। সরু পা ক্ষীণাঙ্গ শিশুটি তার সর্বশক্তি দিয়ে জড়িয়ে ধরে রেখেছে আমার গলা। বিন্দু-মাত্র শিথিল করে নি। পরম বিশ্বাসে আমাকে সে তার খুল্লতাত সাব্যস্ত করেছে। এবং কোলের উষ্ণ আশ্রয়টি পেয়ে আপাতত চিৎকারটুকু থামিয়েছে বটে, কিন্তু একটানা ফোঁপাচ্ছে এবং মাঝে মধ্যেই বলে চলেছে—আমায় বাড়ি নিয়ে চলো।

এমন অবস্থায় জীবনে পড়িনি। সম্পূর্ণ অপরিচিত শিশু কাকা মনে করে কোল দখল করেছে, তার মা মাটিতে পড়ে আছড়াচ্ছে, দিশেহারা আমি কাছেপিঠে বন্ধুদের দেখতে পাচ্ছি না। তার ওপর চারপাশ থেকে ঠেলা খাচ্ছি এবং ছোটোখাটো টিকা টিপ্পনীও শুনতে পাচ্ছি। অযাচিত উপদেশ খুচরো হাসাহাসি ও মন্তব্য। ঈশ্বরকে স্মরণ করা ছাড়া আর কী করবো! অপরাধ আমারই! শিশুটি নিশ্চয়ই তার কাকার সঙ্গে আমার দৈর্ঘ্যে প্রস্থে উচ্চতায় চুলের ছাঁট কিংবা চাদরের রং-এ প্রাথমিকভাবে একটি সাদৃশ পেয়েছে। তার বোধহয় সেটুকুই যথেষ্ট। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার মনুষ্যত্ব, আন্তরিকতা যতোই কোমল হোক না কেন, শতকরা একশ' ভাগ নিরুপায় আমি। শিশুটির দাবী মেনে নেওয়ার সামান্য সুযোগ আমার নেই।

ভিড়ের মধ্য থেকেই হঠাৎ পরিচিত গলা শুনলাম।—ওই যে, ওই

যে, ওই তো··· ।

মনে হলো ঈশ্বরের অপার করুণা আর আশীর্বাদ আমার সামনে। কয়েকটি ছেলেকে নিয়ে বন্ধু নিজেই হাজির।

—আরে তোমাকে নিয়ে তো দেখছি খুব মুস্কিল। কোথায় চলে গিয়েছিলে, সেই তখন থেকে খুঁজছি! এখানে বুঝতে পারছো না একবার হারিয়ে গেলে···

খুব স্বাভাবিক বন্ধুর এই মৃদু তিরস্কার। কিন্তু এবার একেবারে আমার সামনে এসে কোলে শিশু আর মাটিতে মহিলা দেখে বিস্ময়ে তারও চোখ কপালে। মুখের কথা তার মুখেই আটকে গেল। গলার সুর পাল্টে গেল।

—কী ব্যাপার! এ কে?

—কিছুই জানি না। এই বাচ্চা আমায় তার কাকা মনে করে কোলে উঠে এসেছে।—নিচের দিকে হাত দেখিয়ে বললাম—ইনি এর মা, নারাণপুর থেকে এসেছেন।

—উহু, তোমার সব জোটেও···বলতে বলতেই বন্ধু ভিড় কাটিয়ে এদিক ওদিক মুখ বাড়িয়ে ডাকলেন দু-একজনকে। আর ঠিক এই সময় আমি অনুভব করলাম, আমার ট্রাউজারের পিছন পকেটে, যেখানে পার্স রয়েছে, একটি টানাটানি। ঘুরে তাড়াতাড়ি দেখবো কিংবা সামলাবো তার কোনো সুযোগ নেই। অসম্ভব ভিড় আমাকে ঘিরে। হাত একটা পিছনে নেব তারও উপায় নেই, শিশুটি ধপাস করে মাটিতে পড়ে যাবে। পরিষ্কার বুঝতে পারলাম—মানি ব্যাগটি ক্রমশ পকেট থেকে উঠে চলে যাচ্ছে আমারই আশে পাশে দাঁড়ানো কারুর হাতের দু আঙুলের টানে।

বন্ধু ফিরে দাঁড়িয়েছেন। এই মুহূর্তে তাঁকে অন্ততঃ আর দ্বিতীয় বিপদটির কথা বলা যায় না।

দ্রুত বন্দোবস্ত হয়ে গেল। কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক এবং সেপাই এসে পড়েছেন। বন্ধু তার পদমর্যাদা বলেই আজন্ম খঞ্জ শিশুটি ও তার

মাকে উদ্ধার কার্যালয়ে পেঁছানর বন্দোবস্ত করে ফেলেছেন। আমরা কার্যালয় পর্যন্ত পেঁাছে দিয়ে এলাম তাদের। এর চেয়ে বেশি নিশ্চয়ই কিছু করা সম্ভব নয়। বেরিয়ে আসার সময়ও শুনতে পাচ্ছিলাম শিশুটির চিৎকার—ও কাকু যেও না, আমি মরে যাবো গো···আমায় বাড়ি নিয়ে যাও···।

ফিরে এলাম লঞ্চ্-এ। হারউড পয়েন্ট-এ ফেরবার জন্য লঞ্চ্ ছেড়ে দিলো। একটা বেসুরো আওয়াজ বেজে চলেছিল একটানা। তার মধ্যেই দুলতে দুলতে ভেসে চললাম।

রাত বেড়েছে। জোয়ার এসেছে গঙ্গায়। উত্তরে স্রোতের টান। লঞ্চ্-এর গায়ে ঢেউ ভাঙা জলের শব্দ উঠছে ছলাৎ ছলাৎ। চুপচাপ বসেছিলাম ডেকের ওপর চাদর জড়িয়ে। বাতাসে শীতের ছুঁচ। কালো জল আর কালো রাত্রির মেঘাচ্ছন্ন পরিবেশে দূরে হলদিয়া বন্দরের আলোগুলো জ্বলছে অচেনা চোখের মতো। জলের গভীরে কাঁপছে তাদের দীর্ঘ ছায়া। আকাশ যেন নেমে এসেছে মাথার ওপর তার ঝিকিমিকি ছড়ানো জুঁই ফুলের বাগান নিয়ে।

কেবলই মনে হচ্ছে বুকের মধ্যে বিঁধে রয়েছে একটা খচখচে কাঁটা। মনে পড়ছে শিশুটির ক্ষীণ ন্যালবেলে পায়ের চেহারা। তার অসহায় চিৎকার। তার মা-এর বিলাপ। এরা কোথা থেকে আসে, কেনই বা আসে, কিসের বিশ্বাসে! আমার পক্ষে বোধহয় কোনোদিনই বোঝা সম্ভব হবে না, এদের বোধ বিশ্বাসের ভিত্তি কোথায়। পাঁচ বছরের একটি বিকলাঙ্গ শিশুকে নিয়ে এই জনসমুদ্রের মেলায় আসার মধ্যে যে অন্ধবিশ্বাস ও ভক্তিভাব রয়েছে আমি তা কোথায় পাবো!

তীর্থক্ষেত্রে আসার অর্থ ও উদ্দেশ্য দুটোই আমার কাছে অন্যরকম। আমার এই কয়েকদিনের ঘুরে বেড়ান বিশেষ তাৎপর্যে চিহ্নিত নয়। কিন্তু এমন জায়গায় লোকে যে পোলিওমাইলাইটিস্-এর চিকিৎসার জন্যও আসে তা তো স্বচক্ষেই দেখলাম। ধন্য আমাদের দেশ! ধন্য আমার দেশবাসী, তাদের বিশ্বাস ভক্তি উপলব্ধি!

আজকের যে শিশু পাঁচ বছরে দাঁড়াতে পারলো না, তার তো আজীবনের জায়গাই বোধহয় বাঁধা হয়ে রইলো এমনই কোনো তীর্থক্ষেত্রে। এখনও সে শিশু। তার জায়গা হয় মা-এর কোলে। এরপর তার ওজন বাড়বে, গোঁফ গজাবে। হাঁটুতে দু টুকরো চামড়া আর হাতে টায়ার কাটা চটি গলাবে। মাটিতে নেমে সে এক বিশাল জায়গা পেয়ে যাবে। তার নাম ভারততীর্থ। এই মহামানবের যে কোনো এক সাগরতীরে আরও কয়েক কোটি বিকলাঙ্গ ভারতবাসীর মতো সে-ও শিখে যাবে দুটি ভজন শ্যামাসঙ্গীত কিংবা রামপ্রসাদী। হাত পেতে বলবে—বাবু দু পয়সা।

হঠাৎই মনে পড়ল কয়েকবছর আগেই সমাপ্ত হয়েছে একটি বৎসর ব্যাপী ডামাডোল আর প্রহসনের ব্যাপার। আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ। রাজনৈতিক নেতা শিক্ষাবিদ সমাজসেবী সকলেই তা সচেতনভাবে পালন করেছেন। সরকারী বেসরকারী অজস্র টাকা ঢালা হয়েছে। ট্রেনের দেয়ালে কাগজ সাঁটা হয়েছে "শিশুরাই জাতির ভবিষ্যত।" ফুলের তোড়ার মতো এক এক গুচ্ছ বাছা বাছা ফুটফুটে সরল শিশু নিয়ে কলামন্দির রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠান হয়েছে। "বসে আঁকো" প্রতি-যোগিতায় তারা জলে ভাসা নৌকা এঁকেছে। পত্র পত্রিকায় ছবি ছাপা হয়েছে। সমাজের মাতব্বরেরা গাল টিপে লালিপপ্ বিলিয়ে-ছেন। আমরা তথ্যচিত্রে মন্ত্রীদের কোঁচকানো করুণ চোখে শিশুদের ভালোবেসে বুকে টানাও দেখেছি।

আমরা গ্রামাঞ্চল শহরতলীর লক্ষ লক্ষ শিশুর ভেজা লাল ঠোঁট ফাঁক করে আধ চামচ পোলিও ভ্যাকসিন ঢেলে দিতে পারিনি। একটুখানি ট্রিপ্‌ল-এ্যান্টিজেন ফুঁড়ে দিতে পারিনি তাদের নরম উরুতে। অথচ বিদেশীরা বিনা পয়সাতেই আমাদের এসব প্রতি-ষেধক দিতে চায়, দেয়। শিশুরা পায় না। অন্ধ খঞ্জ বিকলাঙ্গদের সংখ্যায় আমরা অনেক উচুঁতে থাকি। আমাদের জাতীয় চরিত্র মহানুভবতা উদ্যোগ কিন্তু কথনই সাড়ম্বরে কোনো কিছু পালনের

ত্রুটি করে না।

আলোর রোশনাই দেখে আর হৈ হট্টগোল কানে আসায় বুঝলাম লঞ্চ্ ভিড়তে চলেছে হারউড পয়েণ্ট-এ। বন্ধুর পীড়াপিড়ি সত্বেও তাকে বোঝালাম এই রাত্রে আর ডায়মণ্ডহারবার ফিরে যাওয়ার কোনো অর্থ হয় না। ভুরিভোজের আয়োজন সেখানে আছে জানি। কিন্তু আগামীকাল ভোরেই আবার লঞ্চ পেরিয়ে কচুবেড়িয়া থেকে সঙ্গমের বাস ধরবো। সেক্ষেত্রে কাকদ্বীপে থেকে যাওয়াটাই সুবিধা। স্থানীয় পঞ্চায়েত অফিসার মশায়ের সহযোগিতায় একটি বাড়িতে থাকার বন্দোবস্ত করতে অসুবিধা হলো না।

কিন্তু অসুবিধা অন্য জায়গায় ছিল। চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে বন্ধুকে মানিব্যাগ খোয়ানোর কথা জানালাম। সামান্য কিছু রেস্ত পকেটে না থাকলে পথ চলবো কেমন করে!

বন্ধু হেসে মাথা নেড়ে কিছু না বলে নিজের পকেটের যাবতীয় টাকা পয়সা আমার হাতে তুলে দিলেন

খেতে গেলাম মোটামুটি পরিচ্ছন্ন একটি হোটেলে। এই সময়ের তুলনায় ব্যবস্থা যথেষ্ট বলতে হবে।

বাঙালীর ছেলে, সারাদিন ঘোরাঘুরি দৌড়-ঝাঁপের পরে পরিষ্কার একটি থালায় ঝরঝরে ধোঁয়া ওঠা গরম সাদা ভাত দেখেই এতোক্ষণ চেপে থাকা অদৃশ্য ক্ষুধার অনুভূতি টের পাচ্ছি। তার ওপর সঙ্গে জিরে আদায় সাঁতলানো টমাটো দেওয়া কাঁচা মুগের ডাল, বাঁধা-কপির তরকারি আর একটি বড় রুই মাছের টুকরো। যদিও মাছের ঝোলের স্বাদ আধভাঙা সরষে আর কাঁচা লঙ্কার গুনে ব্রহ্মতালুতে গিয়ে পেঁছায়, তবু এই খাবারের সঙ্গে একটু ধনেপাতার চাটনি আর কাঁচা পেঁয়াজ নুনের টাক্না, ওই সময়ের ক্ষিদের সঙ্গে অতুলনীয়।

কাকদ্বীপের সর্বত্রই মনে হচ্ছিল একটি উৎসবের আয়োজন। বিদ্যুতের

আলো যেখানে কম সেখানেই রাস্তার মোড়ে মোড়ে বাঁশের খুঁটির সঙ্গে বাঁধা রয়েছে হ্যাজাক। মানচিত্র আর তীর দিয়ে রাস্তার নির্দেশ দেওয়া রয়েছে যত্রতত্র। যে কোনো ফাঁকা জায়গাতেই বানানো হয়েছে অস্থায়ী বাঁশ হোগলার রাত কাটানো ছাউনি। আশ্রয় নিয়েছেন অজস্র তীর্থযাত্রী। আস্তানায় ফিরে আসছিলাম। রাত বেড়েছে বলেই বোধহয় আপাতত একটি ক্লান্ত মফস্বলী চেহারা স্পষ্ট। তার ওপর শীতের রাত, ঠাণ্ডা। হ্যাজাকের তেল কমে আসছে। সারাদিনের কর্মব্যস্ততায় ঢিলে পড়ছে। রাস্তার পাশে ছোট ছোট ডেরায় স্বেচ্ছাসেবীদেরও দেখে মনে হলো, হাই ওঠা ভারি চোখের পাতা নেমে আসতে চাইছে। সত্যি বলতে কী, আমারও অনভ্যস্ত পায়ের পেশী এবার বিশ্রাম চাইছে। শরীরের ক্লান্তি তো আছেই। তার সঙ্গে মিশেছে আনন্দ অবসাদ আর অগুনতি বৈচিত্রের ধারাবাহিকতা। কখনও স্থির, কখনও চলমান। সবকিছু মিলেমিশেই যেন মাথার মধ্যে রিমঝিম, অস্পষ্ট কিরণে সব থির থির করে কাঁপছে।

পাজামা পরে বিছানায় ঢলে পড়লাম। একটি পরিষ্কার চাদর পাতা আর একটি নাইলনের মশারি টাঙানো। এর চেয়ে বিলাসতা গঙ্গাসাগরের যাত্রীর ভাবা উচিত!

ঘুমে তলিয়ে যাওয়ার আগেই সেই দুর্বল খঞ্জ শিশুটির মুখ ভেসে উঠলো চোখের ওপর। চাদরটা গায়ে দিতে গিয়েই বোধহয় এই মনে পড়া। কেননা, এখনও তার লালা, চোখের কাজল আর গায়ের গন্ধ লেগে রয়েছে আমার চাদরে। সবকিছু বুঝে শুনেও ইমোশনের কাছে মানুষ কি অসহায়! নয়তো এ সময় আর আমার চোখের পাতা ভিজে ভিজে লাগবে কেন! মনেমনে প্রার্থনা করলাম, শিশুটি তার মা-এর সঙ্গে যেন তাদের নারাণপুরের বাড়িতে পেঁছে যায়।

দূরে কোথাও ঢিমেতালে খোল করতাল বাজিয়ে কীর্তন চলছিল। কানে তার শব্দ ভেসে আসতে আসতেই গভীর ঘুম আপন করে নিল।

বন্ধ দরজার ওপর দুম দুম আওয়াজে ঘুম ভাঙলো। ধড়মড় করে উঠে বসলাম।

—বাবু ছটা বেজে গ্যাছে, উঠুন, চা নিন।—বাইরে থেকে একটি অল্প বয়সী ছেলের গলা পেলাম।

খুব অবাক হলাম। যতোদূর মনে পড়ছে, গত রাত্রে এমন কোনো বন্দোবস্ত করে রাখিনি। কিন্তু ডেকে তোলাটা যে কতো কাজে লেগেছে এখন বুঝতে পারছি। নয়তো সাড়ে ছটার মধ্যেই যে বেরিয়ে পড়ার কথা রয়েছে, তা আর রাখতে পারতাম না। উঠে দরজা খুলে দিলাম। সামনে ধোঁয়া ওঠা এক কাপ গরম চা।

—কে পাঠালো রে চা!

—ওই যে বৌদি। ছেলেটা ডানদিকে হাত ঘুরিয়ে দেখালো।—মুখ ধোওয়া দাড়ি কামানোর গরম জল দেবো?

এ তো বড় তাজ্জবের কথা! আমি যাবো গঙ্গাসাগরে, অথচ দায় যেন কিভাবে এর ওর তার ঘাড়ে। ভোরবেলা ঘুম থেকে ডেকে দেওয়াটাই যথেষ্ট। আমি কৃতজ্ঞ, তার ওপর এক কাপ চা। ভাবা যায় না। এখন আবার গরম জলও দিতে চাইছে! কপালের আর নাম যে গোপাল, এই মুহূর্তে আমি তা অনুভব করছি।

কিন্তু বৌদিটি কে? কে সেই মহীয়সী যিনি অকস্মাৎ আমার প্রতি এতো সদয়! পঞ্চায়েত অফিসার মশাই কি গতকাল রাত্রে তাহলে পাশের বাড়িতে বলে গিয়েছিলেন কিছু?

গতরাত্রে একটু দেরি করে ফিরেছিলাম। ক্লান্ত ছিলাম, বাড়িটারও মোটামুটি আলো সব নেভানো ছিল, ভালো ঠাহর পাইনি। এখন দিনের আলোয় দেখতে পাচ্ছি একটি দোতলা বাড়ির আমি প্রায় অর্ধেক অধিকার করে রয়েছি। সম্ভবতঃ কোনো একটি পরিবারের ফ্ল্যাট, যাঁরা আপাতত নেই এখানে। বাড়িটা সোজা সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে বাম ও দক্ষিণে পুরোপুরি আলাদা দুখানা ফ্ল্যাট। আমি

আছি দক্ষিণেরটিতে। যে ছেলেটি আমায় ডেকে দিলো এবং চা নিয়ে এসেছে, তার কথা মতো আমার চা পাঠিয়েছেন বাঁদিকের ফ্ল্যাটের কোনো মহিলা। সম্ভবতঃ ছেলেটি ওই বাড়িতে কাজকর্ম করে। ব্যাপারটা কী জানার কৌতূহল হচ্ছিল। তার আগেই ছেলেটা তাড়া লাগালো।

—কই বলুন, এখন আনবো নাকি একটু পরে ?

—এঁ্যা ! ওহ্‌, আচ্ছা। আচ্ছা, পাঁচ মিনিট পরেই নিয়ে এসো।

ছেলেটা শিস্‌ দিয়ে গান করতে করতে চলে গেল। দরজাটা ভেজিয়ে চা এর কাপে চুমুক দিলাম। শুনতে পেলাম, ছেলেটি চেঁচিয়ে কারুর উদ্দেশ্যে বলছে—এখন নয়, পাঁচ মিনিট পরে।

শুনতে পাচ্ছি আর একটি ব্যাপার ঘুম ভাঙার পর থেকেই। খুব খোলা দরাজ কোনো পুরুষ কণ্ঠস্বর সকাল থেকে রেওয়াজ করে চলেছেন। সে কণ্ঠস্বরও যে পাশের ফ্ল্যাট থেকেই আসছে, দরজা খোলার পর তা বুঝতে পেরেছি। সঙ্গে তানপুরার আওয়াজ রয়েছে এবং ভদ্রলোকের গলার ওঠানামা কাজ ইত্যাদি শুনে মনে হচ্ছে সঙ্গীতচর্চায় তিনি রীতিমতো পারদর্শী এবং নিষ্ঠাবান।

কিন্তু আমার আপাতত ও রসে মজার কোনো উপায় নেই। সময় অতি কম। সাড়ে ছটার মধ্যেই পঞ্চায়েত অফিসার মশাই আমাকে তাঁর গাড়িতে তুলে নিয়ে যাবেন কথা আছে। সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যে কচুবেড়িয়ার লঞ্চ-এ তুলে দেবেন। দু চার মিনিট সময় অতিরিক্ত নেওয়া যেতে পারে কিন্তু তার চেয়ে বেশি একজন ব্যস্ত মানুষকে দেরি করাবো, ভাবতেই আমার ভদ্রতায় বাধে।

এক চুমুকে চা শেষ করে ব্রাশ পেস্ট নিয়ে দরজা খুলেই ডানদিকের বাথরুমে ঢুকে পড়লাম। পাশের ফ্ল্যাট এবং সেই বৌদি সম্বন্ধে যতো কৌতূহলই থাক, আপাতত তাড়াহুড়ো করে তৈরি হয়ে নেওয়াটা বেশি জরুরী। বাথরুমে জল বালতি মগ সব ব্যবস্থাই দিব্যি রয়েছে। সুতরাং “বসতে পেলে শুতে চায়” মানসিকতায় একটু স্নান করে

নেবো এখন এই প্রস্তুতি নিয়ে মুখ ধুয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলাম।
তোয়ালে সাবান সব সঙ্গেই ছিল ঝোলার মধ্যে। দ্রুত সঙ্গে রেজর ইত্যাদি দিয়ে তোয়ালে জড়িয়ে জামা গেঞ্জি কাঁধে ফেলে দরজা খুলে বেরুতে যাবো, সামনেই সেই ছেলেটি। হাতে একটি মাঝারি সাইজের বালতিতে প্রায় এক বালতি গরম জল।
—বাথরুমে দিয়ে দিচ্ছি। স্নানের জলও হয়ে যাবে। —ছেলেটা আর দাঁড়াল না। বালতি নিয়ে বাথরুমে রাখতে গেল।
একেবারে অবাক কাণ্ড। চাওয়ার আগেই পাওয়া! কিন্তু ভাববার সময় নেই। ঘরে রাখা টাইমপীস্-এর কাঁটা ছ'টা বেজে পনের কুড়ির মাঝামাঝি। বড় জোর আর পনেরো মিনিট পঞ্চায়েত অফিসার মশায়ের আসতে দেরি।
বারান্দায় পা দিয়ে বাথরুমে ঢুকবো, সামনেই রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়ান চেহারাটি দেখে মনে হলো, মুহূর্তের মধ্যে কয়েক শ' পায়রা ঝট্‌পট্‌ করে ডানা ঝাপটে উড়ে গেল। মুখের দিকে তাকিয়ে দু এক সেকেণ্ড কোনো শব্দ পর্যন্ত বেরুল না। এ কী অদ্ভুত ব্যাপার!
আমার বিস্মিত চমকের মধ্যেই শুনতে পেলাম মহিলা কণ্ঠ।—তাহলে ঠিক-ই ধরেছি!
পারমিতা। খুব সাদাসিধে বাড়ির পোষাক। গায়ে জড়ানো কমলা রং চাদর। চুলে ঘুম থেকে ওঠার উড়ু উড়ু ভাব। চোখ মুখ সদ্য ধুয়ে আসায় সতেজ। আটপৌরে বাসি শাড়ি পরা পারমিতা কোমরে সামান্য ভাঁজ ফেলে রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সামনে। ঠোঁটের কোণে ঝুলছে সামান্য এক টুকরো এমন হাসি যার অর্থ কোনো পুরুষ মানুষ জীবনে বোঝেনি। শরীরের টান যেন একটু ভারির দিকেই। হাত দুখানা চাদরের নিচে বুকের সামনে ভাঁজ করা।
মনে হলো জাদুকরের কাঠি মুহূর্তের মধ্যে ছুঁয়ে আমাকে পাথর

করেছে। পায়ে দিয়েছে পেরেক ঠুকে। ঘড়ির কাঁটা যে সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে টিক টিক করে নড়ে নড়ে সরে যাচ্ছে তাও আমার কানে চোখে কিংবা মাথায় যাচ্ছে না। আচমকা ঘুম ভেঙে জেগে ওঠা ঘোর লাগা গলায় শুধু বলতে পারলাম—এ কী তুমি! পারমিতা?

সেই একই রকম হাসির সঙ্গে শুধু সাদা দাঁতের ঝলকানি দেখতে পেলাম।

—চিনতে অসুবিধে হচ্ছে না কী?

ছেলেটা বাথরুমে বালতি রেখে এঁকেবেঁকে আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। মনে হলো যাওয়ার সময় শুধু একবার অবাক হয়ে ভ্রূ কুঁচকে আমার এবং পারমিতার মুখের দিকে আলাদা আলাদা করে তাকিয়ে গেল।

ঝোড়ো হাওয়ায় খোলা বইয়ের পাতা উড়ে যাওয়ার মতন পনেরো ষোলটা বছর নিমেষের মধ্যে পিছিয়ে গেলাম।

...হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার বছর। নিরিলিতে পড়াশুনা করার প্রয়োজন বলে চিলেকোঠায় থাকার বন্দোবস্ত। বেশি রাত পর্যন্ত পড়বো সুতরাং, লুকিয়ে চুরিয়ে একটি দুটি সিগ্রেট ঘরে এনে রাখি। তা সত্ত্বেও ঘুম পেয়ে গেলে ঘর থেকে ছাদে বেড়িয়ে আসি—পায়চারি করি ঘুম তাড়াতে।

রাত একটু বাড়তে বাড়তেই চুপচাপ পাড়ার অন্য সব বাড়ির আলো নিভে যায়। সামনেই উত্তরের বাড়িটির গ্যারাজের ওপরের ঘরটি ছাড়া। সেখানেও একজন পরীক্ষার্থিণী। কবে থেকে যেন আমার সঙ্গে তার নিঃশব্দ প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। কে কতক্ষণ পড়তে পারে। কার ঘরের আলো কতক্ষণ জ্বলে। আমার ঘরের আলো সাড়ে বারোটায় নিভে গেলে, ও বাড়ির আলো নেভে একটায়। আমি তার পরের দিন আদা জল খেয়ে সওয়া একটা পর্যন্ত জেগে থাকি। দেখাদেখি তো চলেই, কবে থেকে কিভাবে একটু হাত নাড়া-নাড়িও শুরু হয়ে গেছে। বুঝতে পারি না বিশেষ কিছু, তবে

অনুভব করতে পারি অলক্ষ্যে সম্মতির ঘাড় নাড়া।
পাশাপাশি কাছাকাছি এক পাড়ার ছেলে মেয়ে আমরা। পরস্পরকে ভালো করেই চিনি। তবু আমাদের মফস্বলী মানসিকতা সেই পঁয়ষট্টি ছেষট্টি সালে ছেলে মেয়েদের অবাধ মেলামেশা তো দূরের কথা, সামনা সামনি কথা বলাও মেনে নিতো না। কিন্তু কী করা যায়, কিছু দিন যেতে না যেতেই সেই বয়সের অন্তরের হাঁকপাকানি যে আর ঠেকিয়েও রাখা যায় না!
কয়েক দিনের মানসিক প্রস্তুতির পর এক দুপুরে লজ্জা ভয় ত্যাগ করে বীরপুরুষের মতন চলে গেলাম পারমিতাদের বাড়িতে। ভেবে রেখেছিলাম আগেই। সোজাসুজি ওর কাছে তো আর যাওয়া যায় না, কিন্তু এমন একটা কিছু মতলব করতে হবে যাতে একটি মেয়ের সামনা সামনি চলে যাওয়াটা অশোভন না দেখায়। কিন্তু ওই বয়স তো আর বোঝে না যে, আমি যা বুঝতে পারি না, বড়রা তা বোঝে। টের পেয়েছিলাম অবশ্য অনেক পরে। বড়রা বুঝলেও, অনেক ব্যাপার লেট-এ বোঝে, বিশেষতঃ মহিলারা।
দুপুরবেলা পারমিতার দিদিকে গিয়ে বললাম—অদিতিদি, তোমাদের ইংলিশ টু বেঙ্গলী ডিক্সনারীটা আমায় একটু দিতে হবে (পাড়ায় কেন জানি না, আমার কিঞ্চিত ভালো ছেলে বলে পরিচিতি ছিল; কাজে লাগলো সেটাই)। কালকেই দিয়ে যাবো। আমারটা ছিঁড়ে গেছে, বাঁধাতে দিয়েছি।
অদিতিদি য়ুনিভার্সিটির ছাত্রী। কলকাতায় ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে। বোধহয় ছুটি ছিল। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পরে নভেল পড়ছিল। খুব সুন্দর দেখতে। বই থেকে চোখ তুলে বললো—ও মা, তুই বাইরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ভেতরে আয়।
বুক তখনই ঢিপ্ ঢিপ্ করতে শুরু করেছে আপনা আপনি। বারান্দায় চটি খুলে ভিতরে গেলাম।
—হ্যাঁরে খুব পড়ছিস না? কটা সাবজেক্টে লেটার পাবি?

লজ্জা লজ্জা মুখ করে হাসলাম। বললাম—না, না লেটার টেটার পাবো না। কিছু পড়া হয়নি।

অদিতিদি আর কিছু বললো না। ওখানে বসে থেকেই ডাকলো—গোপা, গোপা—। (পারমিতার ডাক নাম)।

ওপর থেকে পারমিতার গলা শুনলাম। ও জানে না আমি ওদের বাড়িতে। অদিতিদি বললো—তুই ওপরে চলে যা, গোপার পড়ার ঘরে ডিক্সনারীটা আছে। নিয়ে যা।

অদিতিদি বইয়ে চোখ রাখলো আবার। আমার বুকের মধ্যে অবিশ্রান্ত ঝোড়ো বাতাসের আনাগোনা। রবারের বল দ্রুত ড্রপ খাচ্ছে। অথচ ঠিক এইটাই তো চেয়েছিলাম।

প্রায় কাঁপতে কাঁপতে ঘামতে ঘামতে পারমিতার ঘরের সামনে। বালিশে বুক চেপে আধ শোওয়া হয়ে গাছ দেখছিল। স্প্রীং-এর মতো লাফিয়ে উঠলো। যেন ভূত দেখেছে। মুখে কথা নেই। আমি সেই অবসরটুকুর মধ্যেই স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করেছি। ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে হেসে বললাম—ডিক্সনারীটা নেবো।

শাড়ি ঠিক করে পারমিতা বিছানায় উঠে বসেছে। আতঙ্কের ব্যাপারটুকু কাটলেও বিস্মিত ভাবটা কাটেনি তখনও। হাত দিয়ে টেবিলের দিকে দেখিয়ে বললো—ওই যে।

লক্ষ্য করলাম ও সোজাসুজি আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে না পারলেও, আড়চোখের চাউনিটা সরাতে পারছে না এবং ক্রমশই সেই চাউনির মধ্যে এক ধরনের কৌতুহলী দুষ্টুমি স্পষ্ট হচ্ছে। তোলপাড় হচ্ছে আমার বুকের মধ্যে, আবার সপ্রতিভ থাকার চেষ্টাও চলছে। টেবিলের ওপর থেকে মোটা ডিক্সনারীটা হাতে নিয়ে বললাম—কেমন হচ্ছে প্রিপারেশান ?

—ভালো না।

—কেন ? খুব তো পড়াশুনা হচ্ছে।

পারমিতা আমার দিকে না তাকিয়ে জবাব দিলো—জানি না।—

তারপরেই চোখের কোণ দিয়ে তাকিয়ে বললো—বাড়িতে ডিক্সনারী নেই ?

মুহূর্তেই হেসে ফেললাম—আছে।

—তবে ?—একই রকমভাবে পারমিতা বললো। মুখে সেই দুষ্টুমির সঙ্গেই যেন এবার সামান্য এক ফালি হাসি।

আমি চোখকান বুজে বলে ফেললাম—উত্তরটা ডিক্সনারীর পাতার মধ্যে কাল দেবো।—বেরিয়ে আসছিলাম কথাটা বলেই। দরজার মুখ থেকে ঘুরে আবার বললাম—দুপুরবেলা, এই সময়।

পারমিতা কোনো উত্তর দিলো না। আমি রাজ্য জয়ের উত্তেজনা নিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে এলাম। বারান্দায় চটি গলিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় অদিতিদি গলা তুলে জিগ্যেস করলো—পেয়েছিস ?

আমি বললাম।—হ্যাঁ, ঠিক আছে। কাল দিয়ে যাবো।

সেই শুরু। সেই জীবনে প্রথম বসন্তের ডাক পেয়ে মাতোয়ারা হয়েছিলাম। প্রায় বছর দেড়েক চলেছিল। আমাদের সেই প্রেমের শীর্ষবিন্দু মাত্রই একটা সিনেমায় পাশাপাশি বসা ও একটু হাতে হাতে স্পর্শ করা পর্যন্ত উঠেছিল।

পারমিতারা নিজেদের বাড়ি করে হিন্দমোটর না কোন্নগর চলে গিয়েছিল। আমি কলকাতায় কলেজ হস্টেলে। খুব স্বতঃস্ফূর্ত জাগতিক কারণেই আমরা আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু প্রথম আন্তরিকতা প্রেম ও বছর দেড়েকের মধ্যেও কয়েক শ' চিঠি-চাপাটি দেওয়া নেওয়া নিশ্চিতভাবেই আমাদের মধ্যে সূক্ষ্ম অথচ একটি স্থায়ী সম্পর্ক তৈরী করেছিল। এখন ভাবলে হাসি পায় লজ্জা করে। সবই ঠিক, কিন্তু সেই বয়স ও সময়ে চপলতার মধ্যেও যে অনুভূতি ছিল সেটা নিখাদ।

সেই জন্যই বোধহয় এতো বছর পরে সেই পারমিতাকে সম্পূর্ণ অন্য রকম ভাবে দেখেই চিনতেও পেরেছি এবং সেই উত্তেজনাও অনুভব করেছি। কী অদ্ভুত যোগাযোগ! কিন্তু এই মুহূর্তে যে বড়ো

আফশোস হচ্ছে, হাতে একটা মিনিটও সময় নেই অথচ সেই পারমিতা আমাকে কৃতজ্ঞতায় আবন্ধ করলো।

স্তব্ধতার মধ্যে কেটে গেছে কটা সেকেণ্ড মনে নেই। চোখ তুলে তাকালাম। বয়স বিবাহ এবং আনুষঙ্গিক আরও কিছু অনিবার্য পরিবর্তন চেহারায় এলেও, এখন পারমিতা নিশ্চয়ই আরও সুন্দর হয়েছে দেখতে। অন্ততঃ আমার চোখে তাই মনে হলো। বলার কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু কিছু না বললেও চলে না।

—কেমন আছো?

—কী মনে হচ্ছে দেখে?

—খারাপ কী, ভালই তো।

—তাহলে ভালো।—একটু থেমে পাবমিতা আবার বললো—হঠাৎ গঙ্গাসাগর যাওয়ার কী হলো?

—কিছু না, এমনিই।—হাসলাম।

—ঢঙ!—পারমিতার হাসিটা একটু বেঁকে গেল। খুব ভালো লাগলো কথাটা শুনে। আবার বললো—বিলেত থেকে কবে ফিরলে?

—মাস দেড়েক। তুমি জানলে কোত্থেকে?

—খুব শক্ত নাকি জানা! তোমার সব খবরই রাখি। খুব বড় ডাক্তার হয়েছো।—শেষের কথাটা বলার সঙ্গে খুব চাপা একটু বুকের হাওয়া পারমিতার গলার শব্দে বেরিয়ে এলো মনে হলো—

তাড়াতাড়ি বললাম—না, না।—একটু প্রসঙ্গান্তরে গেলাম। তোমার কর্তা কোথায়?

—শুনতে পাচ্ছো না গলা?

—ওহ্ হো, তাই নাকি? বাহ্, চমৎকার গলা। অনেকক্ষণ থেকেই তো শুনছি।

—আচ্ছা! কবে ফিরবে সাগর থেকে?—পুরো অন্য কথা বললো পারমিতা।

—দেখি, ঠিক নেই তো কিছুরই।—একটু থেমে বললাম—কেন?

—এখানে হয়ে যাবে । খাওয়া-দাওয়া সেরে ফিরবে ।

—সত্যি ! মিটমিটে হাসবার চেষ্টা করলাম ।—তোমাকে দেখার পর তো আর গঙ্গাসাগর যেতেই ইচ্ছে করছে না ।

—থাক্ ।—যেন পারমিতার হাতটাই চাপা পড়লো আমার মুখের ওপর । আবার বললো—বাথরুমে ঢুকে পড়ো । ঠান্ডা লাগছে । তাছাড়া মিস্টার নস্করও এসে পড়বেন ।

—কে ?—একটু আনমনা হয়েই বললাম ।

—মিস্টার নস্কর, পঞ্চায়েত অফিসার ।

ঠিকই তো । একেবারে অন্য জগতে চলে গিয়েছিলাম মনে হচ্ছিল । এদিকে সময় বয়ে যাচ্ছে । তাড়াতাড়ি পারমিতার দিকে তাকিয়ে হেসে বাথরুমে ঢুকে পড়লাম ।

আট দশ মিনিটের মধ্যেই শেভ করে স্নান সেরে ঝরঝরে হয়ে বেরিয়ে এলাম । ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই সেই ছেলেটা আবার এসে হাজির । শুনলাম, পঞ্চায়েত অফিসার মশাই-এর মধ্যেই একবার ঘুরে গেছেন এবং বলে গেছেন আমি যেন তৈরি হয়েই থাকি । উনি গাড়িতে পেট্রোল ভরতে যাচ্ছেন । মিনিট দশের মধ্যেই আসবেন ।

অতি উত্তম কথা । যদিও এখন এখানেই পৌনে সাতটা, কিন্তু আমার কোনো দোষ নেই । তৈরি হ'তে যেটুকু বাকী তার জন্য দশ মিনিট যথেষ্ট । জামা-কাপড় পালটে মাথা আঁচড়ে ব্যাগের চেন আটকাতে গিয়েই বুঝতে পারলাম, পারমিতার সঙ্গে আর একবার চোখের দেখা হওয়ার জন্যও মনটা ছুঁক ছুঁক করছে ।

কথাটা ভাবাও বোধহয় আমার সম্পূর্ণ হয়নি, দেখি দরজায় পারমিতা। এটুকু সময়ের মধ্যেই যেন আবার নতুন । শাড়ি পালটে নিয়েছে । মাথায় বোধহয় বুলিয়েছে চিরুণী । ওর হাতে কাঁচের গ্লাস, দেখে মনে হলো ফলের রস, অন্য হাতে একটা ছোট কাঁচের বাটিতে জোড়া ডিমের পোচ্ ।

আমি ডাকলাম—ভেতরে এসো ।

নিচের ফ্ল্যাটের দিকে তাকিয়ে দরজার ভিতরে এলো পারমিতা। টেব্‌লের ওপর গ্লাস বাটি রাখলো।

—এর বেশি আর কিছু ব্যবস্থা করা গেল না এই সকালে।

—এটা কী কম!

—ভনিতা করার দরকার নেই।

—তোমার স্বামীর সঙ্গে আলাপ হলো না। কথাটা বললাম, ডিমের পোচ মুখে নিয়ে। আমার অবচেতন মনেরই প্রতিক্রিয়া এ কথাটা। আমার সৌজন্য বোধ।

—হবে, পরের বার। সাগর থেকে ফেরার পরে।—একটু যেন ইতস্ততঃ করলো পারমিতা। তারপর মুখ নামিয়ে বললো—এবার দেখা করতে গেলে দেরি হয়ে যাবে। ও তো নিজে আসতে পারবে না, গিয়ে দেখা করতে হবে।

—ওহ্‌ আচ্ছা!—একটু অবাক হয়েই বললাম, কেননা পারমিতার বলার মধ্যে কী যেন ছিল। জিগ্যেস করা ঠিক হবে কি হবে না, ভাবতে ভাবতেই বলে ফেললাম—কেন, কোনো অসুবিধে এখানে—

—তোমাদের ভাষায় ওর প্যারাপ্লেজিয়া। স্পাইনাল কর্ড-এ ইনজুরি হয়ে দুপা প্যারালিসিস। —পারমিতা থামলো। আবার বললো—ও মেরিন এঞ্জিনীয়র। জাহাজের আপার থেকে লোয়ার ডেক্-এ পড়ে গিয়েছিল।

পারমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। ওর মুখ থেকে বেরুনো শব্দগুলো কানে ঢুকেছে আমার, তা সত্বেও যেন এতো দ্রুত নির্দিষ্ট অর্থে বোধগম্য হচ্ছে না। কানে আমার বাজছে একটি ভরাট সুরেলা কণ্ঠস্বর। আর চলচ্ছক্তিহীন পঙ্গু একটি মানুষ চোখের ওপর। দেখতে পাচ্ছি পারমিতাকেও। কিন্তু এ আমার এক সময়ের ঘনিষ্ঠ সেই পারমিতা না। অন্য কেউ। মহীয়সী এক মহিলা যে তার নিশ্চিন্ত জীবনটাকে উৎসর্গ করেছে শুধু মনুষ্যত্বের খাতিরে একজন প্রতিবন্ধীর জন্য। ক্ষোভ নেই এতটুকু।

কপাল চাপড়াতে ইচ্ছে করছে আমার—কেন দেখা হলো পারমিতার সঙ্গে ! ওর জীবনের এই ট্রাজেডিতে প্রত্যক্ষভাবে আমার কোনো ভূমিকা নেই। কিন্তু একটা সময় পারমিতার সঙ্গে সামান্য একটু সম্পর্ক আমার বুকের মধ্যে ঝড় তুলেছিল। যদি নাও তুলতো তাহলেও আমার পরিচিতা কোনো একজন মহিলার শুধু কষ্টের জীবনযাপনটুকু তো আমার না জানলেই ভালো হতো। কেননা, আমি কি ওর আর কোনো প্রয়োজনে লাগতে পারবো !

—ফলের রসটা পড়ে রয়েছে !—পারমিতার গলা শুনলাম।—মিষ্টার নস্কর এসে পড়েছেন, গাড়ির হর্ণ বাজছে। পারমিতার কথা শেষ হতে না হতেই সেই ছেলেটা এসে জানালো—পঞ্চায়েতবাবু নিচে যেতে বলছেন। দ্রুত ঝাঁকানি খেলাম। ব্যাগ কাঁধে নিয়ে, ফলের রসটুকু এক চুমুকে শেষ করে দিলাম। তাকাতে পারছিলাম না আর পারমিতার মুখের দিকে।

—চললাম।—খুব আস্তে বলে দরজার বাইরে পা রাখলাম।

—চললাম না, আসছি। ফেরার পথে একবারটি হয়ে যেও।

সিঁড়ির মুখে এসে তাকালাম পারমিতার মুখের দিকে। নিটোল ফর্সা মুখ। দীর্ঘ ভরাট চেহারা। চোখের চাউনিতেই যেন অনেক কথার অভিব্যক্তি একসঙ্গে থমকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওই চোখমুখের দিকে সোজাসুজি বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকার শক্তি আমি অর্জন করিনি।

ছোট করে শুধু—আচ্ছা দেখি—বলে নেমে গেলাম সিঁড়ি দিয়ে।

গুড মর্ণিং—। অভ্যর্থনা করলেন পঞ্চায়েত অফিসার মশাই।

নেহাত উত্তর দেওয়ার মতো করেই ভদ্রতাবশতঃ যেটুকু বলতে হয় সেইভাবে—গুড মর্ণিং বলে ঢুকে পড়লাম গাড়ির খোপের মধ্যে। গাড়ি ছুটলো হারউড পয়েন্ট-এর লক্ষ্যে। রাস্তাঘাটে রীতিমতো লোকজনের ভিড়। আমি তার মধ্যেই নীরবে ভাসতে লাগলাম অন্য এক প্রবাহে।

উজ্জ্বল চড়া রোদ উঠেছে সকাল নটার মধ্যেই । পঞ্চায়েত অফিসার মশায়ের ব্যবস্থাপনায় হারউড পয়েণ্ট থেকে নির্বিঘ্নে কচুবেড়িয়া চলে এসেছি । রাস্তাঘাটে লঞ্চে ওঠার লাইনে সর্বত্র অসম্ভব ভিড় । তার-মধ্যেই একটি লঞ্চের ডেক্-এ আমায় জায়গা করে দিয়েছিলেন পঞ্চায়েত অফিসার, নয়তো নদী পার হতেই আমার দুপুর গড়িয়ে যেতো ।

বাসেও বলা-কওয়া ছিল । ড্রাইভার সাহেবের পাশের খোপটিতে ঠাঁই পেয়েছি, নেহাত উপজেলাশাসক মশায়ের অতিথি আমি এই খাতিরে ।

কচুবেড়িয়া থেকে সাগরদ্বীপ টার্মিনাল প্রায় বিশ কিলোমিটার । যেতে ঘণ্টাখানেকের ওপর সময় লাগবে । ঠেসে ঠুসে যাত্রী নিয়ে বাস ছেড়ে দিলো । যেখানটায় বসেছি সেখানে সীট বলে কিছু নেই । টিনের পাত ঢাকা দেওয়া উঁচু এঞ্জিনের পাশে কয়েকটা তক্তা পাতা । তার ওপর বিচুলি বিছিয়ে বসেছি । এঞ্জিনের গরম ভাপ লাগছে ঠিকই কিন্তু বাসের ভিতরে যা অবস্থা সে তুলনায় রাজার হালে যাচ্ছি বলতে হবে ।

কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর রাস্তার চেহারা অন্যরকম হলো । ক্রমাগত মানুষের মাথা বস্তা পুঁটলি দেখতে দেখতে আর বাস রিক্সার হর্ন শুনতে শুনতে মাথা ঝিমঝিম করছিল । এবার কিছু ফাঁকা মাঠ ঘাট গাছপালা দেখতে পেলাম । মাঝে মধ্যেই ছোটখাট ঘেরা ক্ষেতের মধ্যে শীতের তেজী পালংশাক ধনেপাতা মটরশুঁটি দেখতে পাচ্ছি । আমার শহুরে চোখ দিব্যি আরাম করছিল অবারিত সবুজে ।

রাস্তায় লোকজন যাত্রী তোলার জন্য বাস দাঁড়াচ্ছিল মাঝে মাঝে । দু একবার আমার মনে হলো, বাসের কণ্ডাক্টর এবং হেল্পার বেশ কিছুক্ষণ থেকেই পুরো কেবিনটায় আমার একলা অধিকার করে যাওয়াটা পছন্দ করছেন না, বিশেষত এই সময়ে । খুব স্বাভাবিক সেটাই । বলতে কী, আমি নিজেও ব্যাপারটা বুঝতে পারার পর

থেকেই বেশ অস্বস্তিতে ছিলাম। খাতিরটা আমার উপজেলা শাসকের দৌলতে। এমনিতেই যথেষ্ট সুযোগ সুবিধে পাচ্ছি। তার ওপর অতিরিক্ত পেলে স্বভাবতই আমারও কুণ্ঠিত হওয়ার কারণ আছে অস্বস্তিটা সেইজন্যই।

এক তেমাথার মোড়ে গাড়ি দাঁড়াল। দেখি বাঁ দিকের রাস্তা দিয়ে দীর্ঘ পিঁপড়ের সারির মতন দলে দলে লোক আসছেন। শুনতে পেলাম, ওঁরা নামখানা-চেমাগাড়ি হয়ে গঙ্গাসাগর আসছেন। হঠাৎ কণ্ডাক্টর কেবিন-এর দরজা খুলে প্রায় চ্যাংদোলা করে তিনজন বয়স্ক যাত্রীকে ভিতরে ঢুকিয়ে দিলেন আমার পাশেই। তার অস্বস্তি কাটানোর বিগলিত হাসি হাসলেন আমার দিকে তাকিয়ে।

—অপরাধ নেবেন না, স্যার। কষ্ট দিচ্ছি আপনাকে। বুড়ো মানুষ তো, কোথায় ঢোকাবো বলুন, যা অবস্থা পিছনে—

বলতে বলতেই কণ্ডাক্টর বাসের গায়ে দুম দুম ঠুকে দিলেন।—চল ভাই চল। বাঁয়া ঠিক হ্যায়।

বাস ছুটলো। আমার কিছু বলার সুযোগ হয়নি। তবে একজন থেকে চারজন হয়ে ভিতরে ভিতরে স্বস্তি পেলাম। এখন আমিও অন্য যাত্রীদের শরিক। হাঁটু মুড়ে গুটিয়ে বেশ কষ্ট করেই যাচ্ছি। সংকোচটা কেটে গেল। ওঁদের দুজন বৃদ্ধা আর একজন বৃদ্ধ। সঙ্গে পোঁটলা পুঁটলি। কথাবার্তা বলতে বলতে একটি মিশ্রিত ভাষা থেকে উদ্ধার করলাম—এঁরা হিমাচল প্রদেশের বাসিন্দা। ভেবে মজা লাগলো—এবার আক্ষরিক অর্থেই আসমুদ্র হিমাচলের যাত্রীরা চলেছি গঙ্গাসাগর।

ক্রমশ লক্ষ্য করছিলাম পথের দুপাশে দোকান পাট পদযাত্রীর সংখ্যা এবং ব্যস্ততা বাড়ছে। সেইসঙ্গে বাসের মধ্যেও উসখুস, ছাদের ওপর ধুপধাপ। ছোটখাটো নিশানা ছিল সম্ভবত। হঠাৎই যেন কিছু দেখতে পেয়ে সমবেত কণ্ঠস্বর কানের কাছে প্রবল জোরে আছড়ে পড়ল—গঙ্গা মাইকি জয়! পর পর কয়েকবার।

আমার কেবিনের তিন হিমাচলবাসীও ধীরে সুস্থে আওয়াজ দিলেন। একমাত্র নির্লিপ্ত দেখলাম আমাদের ড্রাইভার সাহেবকে। টকটকে লাল রাতজাগা চোখ তাঁর, অত্যন্ত নিরাসক্ত ভঙ্গিতে সামনে তাকিয়ে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে চলেছেন। সম্ভত দিনের মধ্যে বারবার একই জায়গায় একই ধরনের চিৎকার তাঁকে আপনা আপনি নির্লিপ্ত করে দিয়েছে।

আর এক ব্যতিক্রম বোধহয় আমি নিজে। তবে মুখে চেঁচিয়ে না উঠলেও, ভিতরে আমার কৌতূহল—কোথায়, কী দেখা গেল! সোরগোল শোনার পর থেকেই উঁকিঝুঁকি দেওয়ার চেষ্টা করছি। চলন্ত বাসের ভিতর থেকে মুহূর্তের জন্য একবার চিকচিকিয়ে ওঠা জলরাশি আর সারবন্দী থিকথিকে মানুষের মাথার ওপর দিয়ে একটি মন্দিরের চূড়া দেখতে পেলাম। কিন্তু আর কিচ্ছু না। হঠাৎ ধেয়ে আসা ধুলোর ঝাপটায় চোখ আমার অন্ধ। সামনের রাস্তাও ধুলোর ধোঁয়ায় সাদা। বোজা চোখ থেকে দরদর করে জল গড়াচ্ছে। খুলতে পারছি না চোখের পাতা। সেই সঙ্গে শুরু হলো হাঁচি আর কাশি। পকেট থেকে রুমাল বার করে নাকে মুখে চেপে ধরার আগেই যে পরিমাণ ধুলো টেনে নিয়েছি তাতেই আমার শ্বাস বন্ধ হওয়ার যোগাড়। বুঝতে পারছি সাগরদ্বীপে এসে পড়েছি। চোখ না খুলেও অনুভব করছি দুএকটি ছোটখাটো বাঁক নিয়ে বাস দাঁড়াতে চলেছে।

অসম্ভব হল্লা আর গোলমাল চলছে বাইরে। লোকজন নামছে বাস থেকে দুদ্দাড় করে তাদের মালপত্র নিয়ে। কানে আসছে মাইকের একটানা গাঁক গাঁক করা চিৎকার ও ঘোষণা। সেইসঙ্গে ফেরিওয়ালা স্বেচ্ছাসেবী বাস কণ্ডাক্টর আর তীর্থযাত্রীদের মিলিত কণ্ঠস্বর। আমার কেবিনের যাত্রীরা নেমে পড়েছেন। একটু চোখ সইয়ে আমিও ব্যাগ নিয়ে লাফ দিয়ে নামলাম। কিন্তু কোথায় কোন্ দিকে যাবো! স্থির হয়ে দাঁড়াবার কোনো উপায় নেই। ধাক্কা খাচ্ছি ঠেলা খাচ্ছি

মানুষের গায়ের সঙ্গে। শুধু দিশেহারা মানুষের ভিড়। সেই সঙ্গে হাঁচি কাশি আর চোখ জ্বালা। দাঁড়িয়ে দেখবো কিংবা ভাববো তার কোনো সুযোগ নেই। শুধু টালমাটাল হয়ে যাচ্ছি। ঠেলা খেতে খেতে কোথায় চলে যাবো বুঝতে পারছি না। আমার ঘাড়ে মাথায় জিনিষপত্রের ধাক্কা মেরে হৈ হৈ চিৎকার করে পিল পিল করে হাজার হাজার মানুষ যে কে কোথায় কোন্ দিক থেকে আসছে যাচ্ছে কিচ্ছু বুঝে উঠতে পারছি না। নাহ্, এভাবে আর দাঁড়িয়ে থাকা যাবে না। দেরি না করে এবার ভিড়ে গেলাম সেইদিকে যেদিকে দলে দলে কাতারে কাতারে চলেছে লাগাতার মানুষের মিছিল সেই প্রবাহে।

সাগরদ্বীপ থেকে হাঁটা পথে সঙ্গম যাত্রা।

চলেছি মিছিলে। এমন মিছিলে সামিল হইনি কখনও। আবাল-বৃদ্ধ বণিতা অন্ধ খঞ্জ বিকলাঙ্গ বাদ নেই কেউ। নেই কোনো দাবি আদায়ের স্লোগান, হাতে ঝাণ্ডা। উদ্দাম উল্লাসিত কলরব আছে কিন্তু কণ্ঠের ধিক্কারে কারো কালো হাত ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার ঘোষণা নেই। অথচ সামনে পিছনে পাশে শুধু মানুষ, আরও মানুষ। চেনা অচেনা। নারী পুরুষ জাতপাত বলে কোনো ব্যাপার নেই। অন্তত এই মুহূর্তে আপাতদৃষ্টিতে একই লক্ষ্য একই উদ্দেশ্যে ধেয়ে চলেছে একটি চলমান কখনও উচ্চকিত অবিরাম ধারা। মুহুর্মুহু পাঁচমেশালি কণ্ঠস্বরে আওয়াজ উঠছে গঙ্গা মাই কী জয়, সগর রাজা কী জয়!

ধুলোর আস্তরণ কাটিয়ে এবার কিছু কিছু দেখতে পাচ্ছি। সর্ব-রকম ব্যবস্থাই রয়েছে। লোকজন আসা যাওয়ার নির্দেশ অনুসন্ধান কেন্দ্র, ছোট্ট পুলিশ ফাঁড়ি, বিভিন্ন সেবা সংঘের ঝুপড়ি ঘর। উঁচু টঙের ওপর বাস ছাড়া ও দাঁড়ানোর নির্দেশ দেওয়ার জন্য গুমটি। সবই অস্থায়ী, বিয়ে বাড়ির প্যাণ্ডেলের মতো কয়েক দিনের জন্য বানানো।

ধাক্কা খেতে খেতে এগিয়ে চলেছি। কিন্তু একটানা ধুলোর তাণ্ডবে এবার ক্রমশই শঙ্কিত হয়ে উঠছি। একে ঠাণ্ডা লাগার ভয় তার-ওপর ধুলো। আরও খানিকক্ষণ এক নাগাড়ে এই পরিমাণ ধুলো বুকে টেনে নিলে, ডাস্ট্ এলার্জির ধাক্কায় গঙ্গাসাগর ঘুরতে আসা আমার হয়তো ডকে উঠবে।

রুমাল ভাঁজ করে কোনাকুনি বেঁধে নিলাম নাক মুখের ওপর দিয়ে। যতোটুকু আটকানো যায়। মাথার যে কী অবস্থা তা তো না দেখেই আন্দাজ করতে পারছি। খালি হাতেই একবার ঝাড়া দিলাম, মনে হলো ধোঁয়া উড়ে গেল। আর ঠিক এসময়েই একটি ছোট্ট চোঁয়াঢেকুর অম্বলসহ পেট থেকে মুখের মধ্যে হাইজাম্প্ দিয়ে জানিয়ে গেল, সকালবেলা লঞ্চে ওঠার আগে পঞ্চায়েত অফিসার মশায়ের অনুরোধে ভক্ষণ করা চারটি কচুরির অস্তিত্ব।

কত অক্ষম আমি! ধকল বলতে শরীরের ওপর দিয়ে প্রায় কিছুই যায় নি। অথচ এর মধ্যে উপদ্রবের আশংকা মনের মধ্যে জায়গা নিচ্ছে। তিন-চার রাত্রি না ঘুমিয়ে, মাথায় বোঁচকা নিয়ে, কখনো গাড়িতে, কখনো হেঁটে কখনো নৌকায় যাঁরা এসেছেন, তাঁদের চোখ-মুখ দিব্যি উদ্ভাসিত, ঝরঝরে এখন। তীর্থক্ষেত্রের কাছাকাছি পেঁাছেই তাঁদের ক্লান্তি কেটে গিয়েছে। কি জানি কোন্ শক্ত ভিত্-এর ওপরে এইসব মানুষের বোধ বিশ্বাস নির্ভরশীলতা! এসব কি আমি কোনোদিন টের পাবো!

আধা শহুরে সভ্যতা আর পরিবেশে মানুষ আমি। আমার বেড়ে ওঠার জলবায়ু প্রতিনিয়ত ধুলো ধোঁয়াতে আচ্ছন্ন দেখেছি। নির্মল প্রকৃতিতে বুক ভ'রে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ বর্জন আমাদের কাছে বিলাসিতা। সর্দিকাসি পেটের গোলমাল ঠাণ্ডা লাগার হাত থেকে আমাদের রেহাই পাওয়ার উপায় নেই। ওপরের জামাকাপড় সাজ-গোজের নিচে আমাদের শারীরিক কলকব্জা দ্রুত ঠুনকো হয়েই চলেছে। মাঝে মধ্যে টের পাই, পৃথিবীতে আমাদের সময় বড়

বেশি না।

দক্ষিণে যাচ্ছি। পিছন থেকে উত্তরের অবারিত শুকনো হাওয়া আর ধুলো উড়ে আসছে। জনস্রোতের উজানে মাঝে মধ্যে একটা-দুটো সরকারি জীপ কিংবা এ্যাম্বুলেন্স এগিয়ে আসছে এবং অনিবার্য বাধায় ক্ষণে ক্ষণে রুদ্ধ হচ্ছে তাদের যান্ত্রিকগতি। শুধু মানুষের ভিড়ের জন্য তাই নয়। যাত্রীদের মধ্যে এখনো এমন অনেক মানুষ রয়েছেন, যাঁরা একটি চলমান জীপ কিংবা এ্যাম্বুলেন্স্-এর দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখছেন।

কপিলমুনি মন্দিরের মাথা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আর দেখতে পাচ্ছি চাকবাঁধা কালো মাথা। রাস্তার দু পাশে অথবা সামান্য ঢালে নেমে গজিয়ে উঠেছে অসংখ্য দোকান। প্রথম দিকে ফলমূল মুড়ি চানাচুর ঘুঘনি পকোড়ার আধিক্য থাকলেও ক্রমশই একটি তথাকথিত মেলার চেহারা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। পালিশ করা লাঠি, কাঁচের চুড়ি পাথর বাটি মাটির পুতুল থেকে শুরু করে ধর্মমাহাত্ম্য কোকশাস্ত্রের চটি-বই, ঠাকুর দেবতার ছবি, শিকড়বাকড় মাদুলি ভাগ্যগণনার ছক নিয়ে বসে পড়েছেন অনেকে। চোখে পড়ছে আরও একটি অবধারিত তীর্থ-চিত্র। শয়ে শয়ে ভিখারি কুষ্ঠরোগী বিকলাঙ্গ এবং কিম্ভূত দর্শন মানুষ। ছেঁড়া নোংরা কাঁথার মধ্যে থেকে কুষ্ঠরোগী বার করে রেখেছে তার হাতের দগদগে ক্ষত। মাছি বসছে, পয়সা পড়ছে। সাবানের ড্যালার মতো বেরিয়ে আসা দুই চোখের কোণে পিচুটি পড়া জন্মান্ধ মহিলার কোলে রোগা বাচ্ছা। গলায় ফ্রেমে বাঁধানো কাগজ ঝুলিয়ে হাত পেতেছে বোবা বালক। চাকা লাগানো কাঠের বাক্সে পা-হীন পিঠে কুঁজ গোঁফ গজানো মরদ ছেলেকে বসিয়ে ভিক্ষে চাইছে তার বৃদ্ধা মা। নাক মুখের পরিবর্তে একটি ছোট গহ্বরের মধ্য দিয়ে পশুর মতো ঘড়ঘড়ে শব্দে দর্শক আকর্ষণ করছে একটি লোক। এক অভূতপূর্ব শারীর বৈচিত্রের খোলা প্রদর্শনী।

মেলার বিভিন্ন মাইকের চিৎকার কানে আসছে। বাতাসে ভাসা কাঁপা

কাঁপা শব্দের ঢেউ, কখনও জোরে কখনও আস্তে। ডানদিকে ঘুরতে হবে এবার। শক্ত মাটির রাস্তা শেষ হয়ে, শুরু হচ্ছে বালুপথ। সোরগোল স্বভাবতই বেড়েছে। নানা দিকের মানুষজনেরা এবার ক্রমশই ঘনীভূত হতে চলেছেন চরের দিকে। রাস্তায় আসতে আসতে মাঝে মধ্যেই চোখে পড়ছিল চিক চিক করে ওঠা সাগরের জল। এখন আর উপায় নেই। অগণিত মানুষের মাথা আর হোগলার ছাউনি দেওয়া দোকানঘর হোটেল ছাড়া কিছু দেখতে পাচ্ছি না। উদ-ভ্রান্তের মতো শুধু চলেছি। চোখ জ্বালা করছে, নাক মুখ জিভ গলা সব শুকিয়ে কাঠ। টের পাচ্ছি বাঁ পায়ের কড়ে আঙুলে ফোস্কা গলে ছাল উঠেছে। জ্বলছে। একটি পানীয় জলের অস্থায়ী কল ঘিরে শতখানেক নরনারী। চেষ্টা করে লাভ নেই। উপায় নেই দাঁড়ানোর-ও। আরও এগিয়ে যেতে হবে ভিতরে। এখনও সাগর সঙ্গমে নয়; আপাতত যেখানে পেঁছোচ্ছি তা শুধু মানব-সঙ্গমের দোর-গোড়া। কিন্তু যেতে হবে সেইখানে যেখানে চরের ওপর মিলন হতে চলেছে মানবসাগরের সঙ্গে গঙ্গাসাগরের।

একটানা রোদে হাঁটা গরমে চিড়বিড় করে উঠছে ঘেমো গা। অথচ তার মধ্যেই খেলে যাচ্ছে নীরব শিহরণ। মনে হচ্ছে এক মহোৎসবের নিমন্ত্রণে এসেছি। উৎসবের রস ভাব এখানে। সেইভাবরসের ভিয়েনে জমতে এসেছে রসিকরা। কপালে এই শীতের দিনেও ঘামের বিন্দু। তারই মধ্যে হাসি ঠাট্টা তামাশা মস্করা বাচ্চার চিৎকার খোল করতাল বাজিয়ে নামসংকীর্তন, হাঁড়ি বাজিয়ে গান।

ভিড়ের মধ্যে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যাওয়ার জন্য এক আজব পদ্ধতি অবলম্বন করেছে একটি দেহাতি দল। তাদের আঠারো কুড়িজন গায়ে গায়ে লেগে থাকা নারী পুরুষকে ঘিরে একটি মোটা গোরুর দড়ি। তারা কেউ দড়ির বাইরে যাবে না। মাঝে মাঝে তাতে পড়ছে অনিবার্য টান, আর সঙ্গে সঙ্গেই পায়ে পায়ে বেধে গিয়ে এ ওর পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে ঢলে পড়ছে। ছুটছে হাসির লহরা।

আমার কথা সেই একই। ধর্ম মাহাত্ম্যের দোহাই দিয়ে আসলে মুক্তির আনন্দে ভেসে যাওয়া।

একটু ধারের দিকে সরে এলাম। আর পারা যাচ্ছে না। অনেকক্ষণ ধরেই মালুম দিচ্ছিল ফোস্কা গলে যাওয়ার জ্বলুনি। বালির ওপর বসে খুলে নিলাম জুতো মোজা। ভরে নিলাম ব্যাগে। লম্বা দোনালা গোটালাম হাঁটু পর্যন্ত। চলো এবার। জুতোহীন অনভ্যস্ত পায়ের তলা চিড়বিড় করে উঠলেও মনে হলো সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো। জুতোর মধ্যে গরমে ঘামে গলে যাওয়া ফোস্কার জ্বলুনী যে কী জিনিস তা সেই জানে যার হয়।

বালু পথের ওপর দিয়ে কিছুটা হেঁটে এসেই চোখে পড়লো—ওপরের দিকে দুই পা তোলা মুণ্ডহীন একটি মানুষ। জীবিত এবং কোপনি আঁটা এক পুরুষ। কৌতূহল চাপতে পারলাম না, ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলাম দেখতে।

তেল সিঁদুর মাখানো একটি ত্রিশূল পোঁতা রয়েছে অদূরেই। মাটির ভিতর মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছে লোকটি। গলা থেকে তার হাত পা ধড় সবই বাইরে এবং তা ঊর্ধ্বমুখী ও নড়াচড়া করছে। মনে হতে পারে, মাটি থেকে জন্মেছে একটি মানুষগাছ। বিস্তর খুচরো পয়সা পড়েছে তার সামনে মাটিতে।

ব্যাপারটা মা বসুমতীর কাছে হত্যে দেওয়া নাকি কৃচ্ছ্রসাধন না ম্যাজিক ভেলকি দেখিয়ে রোজগারের উপায়, এসব ভাবনার আগেই খুব সহজভাবে মনে আসে, অনির্দিষ্টকাল অক্সিজেনের অভাবে লোকটি বেঁচে আছে কী ভাবে!

কাছে সরে এলাম। নীচু হয়ে অনেকের মধ্যে থেকেই একটু উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম।

ঠিক, যা ভেবেছি। আত্মরক্ষার ব্যবস্থা লোকটি বেশ কায়দা করেই রেখেছে। আসলে সে একটি ফাঁপা গহ্বরের মধ্যে মাথাটি ঢুকিয়েছে, যার ভিতর বাতাস যাতায়াতের জন্য আছে একটি দীর্ঘ মোটা নল।

নলটি মাটির সামান্য নিচে দিয়ে খানিকটা দূরে গিয়ে খোলা। ফাঁপা গহ্বরটিও একটি টিনের ঢাকনা দিয়ে সুরক্ষিত, যার ওপর আলগা মাটি বিছিয়ে মিশিয়ে দিয়েছে সমতলের সঙ্গে।

চালাকি বুজরুকি সত্ত্বেও পদ্ধতিটি কষ্টকর সন্দেহ নেই। বিভিন্ন মন্তব্য কানে আসছিল। বিস্ময় ব্যঙ্গ বক্রোক্তি। আমি এসব কিছুর সঙ্গেই কল্পনায় লোকটির ঘর্মাক্ত লাল মুখটিও দেখছিলাম। সে অন্ততঃ খাদ্যে কিংবা ওষুধে ভেজাল দেওয়ার মতো অপকর্ম করছে না। ধোঁকা দেওয়ার মধ্যেও তার একটি কষ্টকর প্রয়াস রয়েছে।

বালুপথে পা ডুবে যাচ্ছে, টেনে টেনে হাঁটছি। কম্বলসহ ব্যাগটি আপাতত একটি বোঝা বলে মনে হচ্ছে। নিশানা পাচ্ছি না ঠিক কোন্ দিকটায় যাবো। হোগলা আর খড়ের চালা ছাড়াও, বহু ক্লান্ত যাত্রী যেখানে সেখানে এলিয়ে পড়েছেন। সঙ্গে তাঁদের হাঁড়ি কলসী বস্তা পোঁটলা বালতি কাঠ। রাস্তা বন্ধ্। কিন্তু থামবার উপায় নেই। বেঁকে ডিঙিয়ে ঘুরে চলতে হচ্ছে। মন্দিরের চূড়া অনতি-দূরে। যে প্রবাহে মিশে রয়েছি মনে হচ্ছে তার গন্তব্য সেইদিকে।

মন্দিরের সামনে কপিলমুনিকে পূজা দেওয়ার নামে প্রকৃতপক্ষে একটি নারকীয় তাণ্ডব চলেছে। কিন্তু বেরিয়ে আসবো তার আর উপায় নেই। মহামুনি শ্রেষ্ঠমুনি ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত যিনি তাঁকে তুষ্ট করা প্রয়োজন। আখ্যানের বর্ণনায় তিনি অতীব ক্ষমতা-পরায়ণ এবং উগ্র। ধ্যানের বিঘ্ন ঘটায় তিনি রোশানলে দগ্ধ করে-ছিলেন ষাট হাজার সগর পুত্রকে। যে সে লোক নন তিনি। সুতরাং তাঁর প্রস্তর মূর্তি দর্শন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং পুণ্যকর্ম।

আমার অবশ্য পুণ্যার্জন অপেক্ষা আপাততঃ বাধ্যবাধকতা বেশি, কিছু কৌতূহলও অবশ্যই। হালহীন নৌকার মতো জনস্রোতে ভাসতে ভাসতে সামনে পেঁছে গেলাম।

কিন্তু, উরে বাপ্, কী দেখবো! বুকে পিঠে যা চাপ লাগছে তাতে রিব ফ্র্যাকচার হয়ে গেলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। তার ওপর

পিছন দিকের পুণ্যার্থীরা যাঁরা আর সামনে আসার সুযোগ পাচ্ছেন না তাঁরা নির্বিচারে ধুলোবালি মাখা গাঁদাফুল শালপাতা বাতাসা নকুলদানা ছোটখাটো ফলমূল এবং খুচরো পয়সা যথেচ্ছ নিক্ষেপ করে চলেছেন এবং তা বর্ষিত হচ্ছে আমাদের মাথায় গায়ে।

তার মধ্যেই যেটুকু দেখতে পেলাম—মনে হলো সিঁদুররাগে রঞ্জিত তিনটি প্রস্তর মূর্তি। মাঝখানে যোগাসনে বসার ভঙ্গিমায় কপিল-মুনি যাঁর মাথার ওপর পঞ্চনাগ ছত্র। দক্ষিণে চতুর্ভুজা গঙ্গা, বাঁয়ে মহারাজ সগর। আমার কেবলই চোখ যাচ্ছিল ওই মূর্তিত্রয়ের পাশে, যেখানে ফুলপাতা পয়সা সিঁদুর সন্দেশ বাতাসায় দুটি সংক্ষিপ্ত পাহাড় তৈরি হতে চলেছে। উম্মুক্ত অঙ্গে চওড়া উপবীত এবং হাঁটু পর্যন্ত ধুতি পরিহিত জনা চারেক সহকারী পূজারীর হাতে বেলচা ও লাঠির আগায় বাঁধা শক্ত ঝাড়ু। তাঁদের ঘর্মাক্ত চেহারায় সিঁদুর এবং মাঝেমধ্যে নিক্ষিপ্ত উপাচারের আঘাতের দাগ। উপাচারের সঙ্গে মাঝে মাঝেই মাটির ভাঁড় ঢ্যালা ইত্যাদি ছুটে আসছে তাঁদের গায়ে। প্রাণপণে সামনের বেদী পরিষ্কার করতে করতেই তাঁদের চাপা কণ্ঠে সু-শালা। শুয়ার কে বাচ্চা-ও বেরিয়ে আসছে। উপা-চারের পাহাড় জমে উঠছে মূর্তির দু পাশে।

শুনেছিলাম মেলা শেষ হওয়ার পরে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা আয় হয় বিভিন্ন প্রণামী ইত্যাদি মিলিয়ে। সেই বিপুল পরিমাণ অর্থ বস্তা বোঝাই হয়ে চলে যাবে অযোধ্যায় শ্রীসীতারাম দাসজীর গদিতে। কারণ মন্দিরের মালিকানা নাকি উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁদের। সাগরদ্বীপের উন্নতিকল্পেও ব্যয়িত হতে পারবে না এর কানাকড়ি। চেষ্টা চরিত্র কম হয়নি। জল গড়িয়েছিল সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত। কিন্তু আইনের জাল ছিঁড়ে হাত ছোঁয়াতে পারেন নি কেউ।

এর নাম ভারতবর্ষ। মাঝে মাঝে আফশোস হয় আজকাল। মেঘে মেঘে নিজেরও বেলা গড়াচ্ছে। জানতে বুঝতে ইচ্ছে করে নিজের

দেশ, দেশের চেহারা চরিত্র ভাব দর্শন। অথচ কোনো হিসাবেই যেন ঠিক মেলাতে পারি না। আমাদের ধর্ম ইতিহাস দর্শন রাজনীতি সংস্কৃতি সব মিলেমিশে এমন এক সুতোর জট পাকানো অবস্থা যে কিছুতেই যেন একটা থেকে আর একটা আলাদা করা যায় না। কোনোটারই যেন সামগ্রিক চেহারাটা উদ্ধার করতে পারিনা। একটু তলিয়ে ভাবতে গেলেই মনে হয়—অন্ধকারে হাতড়াচ্ছি আনাড়ির মতো। আবার এক সময় পশ্চিম পৃথিবীর অনেক-পাওয়া সভ্যতা দেখে মনে হয়েছে এরা সব চোখে রঙিন কাঁচের চশমা পরে রয়েছে। আমরা শুকনো জর্জরিত ভুখা সবই ঠিক, তবু দৃষ্টি আমাদের সাদা সৌম্য স্বচ্ছ। বড়ো ঝাপসা ধোঁয়াটে এই ভাবনাচিন্তা, আমারই অগভীরতার ফল জানি। তা সত্ত্বেও বলি বড়ই জটিল আমাদের মনস্তত্ত্ব ও দর্শন। বিশেষ কোনো ব্যাখ্যায় বিশ্লেষণ সম্ভব নয় আমাদের অন্তর-বাহির-এর টানাপোড়েন। সন্ধানে সংশোধিত হতে হতে জীবন যাবে। যাক্, তবু এই সন্ধানেরই আর এক নাম নিশ্চয়ই আপনাকে জানা। তা কী কোনোদিন ফুরোয়!

না, ফুরোয় না। মশগুল থাকা যায় আনন্দে।

বন্ধু সরকারী সীল লাগানো একটি চিরকুট দিয়েছিলেন হাতে, রাত্রে থাকার আস্তানা জোটাবার জন্য। মেলা অফিস-এ সেটি দেখানোয় কাজ হলো। অফিসারদের জন্য বানানো অস্থায়ী বাস-স্থানের একটি সংক্ষিপ্ত কোয়ার্টার, প্রয়োজনে অন্য দু একজনের সঙ্গে ভাগ করে থাকতে হতে পারে এইটুকু শর্তে। আমার পক্ষে তাই যথেষ্ট। ফাঁকা বালুচরে লক্ষ মানুষের মেলায় এ ধরনের একটি ঘরে ঢুকতে পারার অর্থ হাতে চাঁদ পাওয়া। তাছাড়া কতক্ষণই বা ঘরে থাকবো! আপাতত হাতের ব্যাগ নামিয়ে চোখেমুখে একটু জলের ঝাপটা দিতে পারলেই বাঁচি।

ছাড়পত্র নিয়ে রাস্তার নির্দেশ বুঝে ঘুরে এলাম। পরিস্থিতি অনুযায়ী খুব সুন্দর ব্যবস্থা বলতে হবে। সারি সারি অনেকগুলি মুখোমুখি

কোয়ার্টার্স-এর সামনে গেট। নেপালী দারোয়ান সেখানে বসে আছেন। দ্বিতীয়টি আমার। হোগলার ছাদ আর দেওয়াল। মেঝের বালির ওপর বিচুলি বিছানো। একটি বিদ্যুত-বাতি ঝুলছে। আলাদা রান্নাঘর কল এবং একটি বাথরুম-ও আছে। ঘরের মধ্যে আরও আছে একটি মোটামুটি সাইজের টেবিল এবং চার-পা-ওয়ালা একটি খাট। আর কী চাই! কজনের জুটেছে এই স্বাচ্ছন্দ্য!

পৌষের শেষেও দুপুরের রোদে উত্তপ্ত হয়েছে বালুচর। কপালে ফুটেছে ঘামের বিন্দু। মাথার উপর একটি নিশ্চিন্ত ছাউনির অস্তিত্ব অনুভব করেই বুঝলাম, পেটের মধ্যে জলন্ত ক্ষিদে হাঁ করে রয়েছে। কেননা সময় ইতিমধ্যে নেহাৎ কম কাটেনি। দুপুর দেড়টা হতে পারে আন্দাজ করলাম। ভাত খাওয়ার প্রত্যাশা করি-না। রোদে বালুতে হাঁটার ধকলে শরীরও আর বইছিল না। রাস্তায় কেনা মুড়ি আর কমলালেবু দিয়ে সারাজীবন মনে রাখার মতো একটি আজব অবিস্মরণীয় মধ্যাহ্নভোজ সেরে নিলাম। পা ধুয়েছিলাম আগেই এবার রুমালের কোণ ছিঁড়ে জড়িয়ে নিলাম আঙুলের গলে যাওয়া ফোস্কার ওপর।

বুঝতে পারছি বাইরে অশান্ত উত্তাল পরিবেশ, পাঁচমিশেলি কণ্ঠ-স্বরের কোলাহল। তথ্য কেন্দ্রের মাইক থেকে কখনও শত কণ্ঠের মিলিত কীর্তন, কখনও উপদেশ নির্দেশ অথবা নিরুদ্দিষ্টের প্রতি আহ্বান। বোঝারূপী সঙ্গের ব্যাগটি ছিল মাথার কাছে, অজান্তেই কখন ঢ'লে পড়েছিলাম তার উপর।

বুঝিনি ঠিক কতক্ষণ সময় কেটে গেছে। তন্দ্রার মধ্যেই মনে হলো পাঁচমিশেলি কয়েকটি কলকল কণ্ঠস্বর কথাবার্তা বলতে বলতে আমার ঘরের মধ্যে ঢুকেই হঠাৎ বিস্ময়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ফিসফাস কথাবার্তা বলছেন নিজেদের মধ্যে। ঘুমের রেশ কাটিয়ে তখনও উঠতে পারিনি, তার মধ্যেই একটি অল্প বয়স্ক ইয়াংকি ও একটি মাঝবয়সী বাঙালী পুরুষ কণ্ঠ কানে পেঁছাল।

—হুজ হি! স্লিপিং ইন আওয়ার রুম!—অল্প বয়সী ছেলের বিরক্তি মাখানো গলা।

—এ কী কাণ্ড, ইনি আবার কিনি?—দ্বিতীয় বিস্মিত বয়স্ক কণ্ঠস্বর।

আমার ঘুমের চটকা ভেঙেছে। মুহূর্তেই সচেতন হয়েছি পরিবেশ এবং পরিস্থিতি সম্বন্ধে। যদিও হতবাক অবস্থাটা তখনও কাটেনি। তবু কানে শোনা দুটি উক্তির লক্ষ্যই যে আমি তা বুঝেছি। মাথায় খেলেছে, উত্তরও কিছু দিতে হবে। কেননা আমি রবাহুত নই, সরকারী অনুমতিপত্র হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকেছি।

একটি অবধারিত হাই ওঠা চাপা দিয়ে কিছু বলতে যাবো, সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি গম্ভীর গলা আমার আগেই কথা বলে উঠলো। ধীর নম্র যেন পিতৃস্নেহে সিঞ্চিত কণ্ঠস্বর।

—নো নো যোশেফ, ঘটকবাবু, নট ইন দ্যাট ওয়ে। উনি একজন ক্লান্ত তীর্থযাত্রী।

তার পরমুহূর্তে কণ্ঠস্বর আমার দিকে। আমিও ঠিক তখনই মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়েছি।

—আপনাকে আমরা বিব্রত করেছি, আপনি ক্ষমা করবেন।

আমার সদ্য ঘুম ভাঙার জড়তার মধ্যেই যেন পর পর কতকগুলো চমক। দৃষ্টিও কিছুটা ধাক্কা খেয়েছে যিনি শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে কথা বললেন তাঁর দিকে তাকিয়ে।

কাঁচাপাকা ব্যাক ব্রাশ করা চুল তাঁর। চোখে ভারি পাওয়ারের চশমা। মাথার চুলের মতোই কাঁচাপাকা চাপদাড়ি গালে। শান্ত সৌম্য মুখ, মাজা গায়ের রং। তাঁর গলা থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা সাদা ধবধবে কোট। সামনে বড় বড় বোতাম। পায়ে কালো বুট। বুকের ওপর কালো কার দিয়ে বাঁধা চকচকে স্টিল-এর ক্রশ। এক-জন পাদ্রীসাহেব কিংবা ইন্স্টিটিউশনের ফাদার-এর মতো চেহারা। তাঁর সঙ্গে আরও চারজন। বছর বারোর একটি ছেলে এবং প্রায়

সমবয়সী একটি মেয়ে। একজন রুক্ষ চুল মাঝবয়সী ঢোলা প্যান্ট আর ঢলঢলে সবুজ সোয়েটার গায়ে দেওয়া ভদ্রলোক। আর একজন টকটকে ফর্সা মহিলা। একেবারে শ্বেতপাথরের তৈরি দুর্গা প্রতিমার মতন মুখ। বয়স তাঁর নিশ্চয়ই চল্লিশের উপরে, শরীরের গড়নে সেরকম ভার। শাড়ির ওপর শাল জড়ানো সত্ত্বেও মনে হলো চেহারার সর্বাদিকেই তাঁর বেশ ভরন্ত পুরন্ত ভাব। নাকের বাঁদিকে ঝিলিক দিচ্ছে একটি ছোট্ট পাথর। বুঝতে পারলাম না তিনি সধবা না বিধবা। যে কোনোটাই হতে পারেন। সঙ্গের ছেলে মেয়ে দুটিকে ভাইবোন বলে মনে হলো। বাকী এঁদের কার কি সম্পর্ক ইত্যাদি ভাবনার আগেই মনে হলো, সৌজন্যবশত পাদ্রীসাহেবের ক্ষমা প্রার্থনা করার উত্তরে কিছু বলতে হয়।

চৌকি ছেড়ে উঠে পড়তে পড়তেই বললাম—না, না, ক্ষমা করার মতো কিছু হয়নি।

আর কিছু বলতে পারলাম না। একেবারে সদ্য ঘুম ভাঙার পর দুটি মন্তব্য শুনে নিশ্চয়ই বিরক্ত হয়েছিলাম সেগুলো উচ্চারণের ভঙ্গিতে ; কিন্তু পরমুহূর্তেই একটি শান্ত কণ্ঠে মৃদু শাসনের সুরে তাদের থামিয়ে দেওয়া এবং পাদ্রীসাহেবের ক্ষমা প্রার্থনায়, বলতে কি, এর মধ্যেই আমি গলে জল হয়ে গেছি। কিন্তু আপাতত এই পরিস্থিতির মধ্যে ঘরে বসে থাকা যায় না, এটুকু ভেবে নিয়েই ব্যাগটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বাইরে বেরিয়ে ভাববো কি করণীয়। মুখ তুলে একবার তাকালাম ওঁদের পুরো দলটার দিকে। সবাই মোটামুটি চুপচাপ দাঁড়িয়ে। আস্তে পাদ্রীসাহেবের দিকে তাকিয়ে বললাম—আপনারা বসুন। —বলে এগিয়ে গেলাম দরজার দিকে।

সবে বাইরে বালির ওপর পা দিয়েছি. বুঝলাম পিঠে হাত। ঘুরে তাকানোমাত্রই সাহেবের শান্ত গলা।

—আপনি যাবেন না। বসুন।

পাদ্রীসাহেবের মুখ আশ্চর্য ঠাণ্ডা ও নিরাসক্ত। অথচ কণ্ঠস্বর স্নেহাসিক্ত। ভারি কাঁচের মধ্য দিয়ে তাঁর দুই চোখ খুব গভীরভাবে নিরীক্ষণ করছে আমাকে। আমি কি করবো, কি বলবো ভাবতে ভাবতেই বলে ফেললাম—আমি একবার মেলা অফিসে ঘুরেআসি। আপনারা সবে এসেছেন, ক্লান্ত, একটু বিশ্রাম করুন। আমি ওঁদের কাছ থেকে জেনেও আসি যদি কোনো অসুবিধা হয়ে থাকে। তাছাড়া আমি তো একলা মানুষ, ঘরে আমার জিনিষপত্রও কিছু নেই। আপনারা বসুন।

—তাহলে না হয় আমরাও যাই।

মহিলার গলা। আমি এগিয়ে বাইরে আসার সঙ্গে গুটি গুটি পুরো দলটাই নিয়ে এসেছেন। সাহেবের পাশ থেকে মহিলা কথাটা বললেন যেন একটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো। তাঁর মুখ তো আমি আগেই দেখেছি। এবার গলা শুনে মনে হলো মুখশ্রীর মতো একই রকম লাবণ্য তাঁর কণ্ঠেও।

পাদ্রীসাহের সময় নিলেন কয়েক সেকেণ্ড। তারপর সেই রুক্ষ চুল ঢোলা প্যাণ্ট মাঝবয়সী ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বললেন—তাহলে মিস্টার ঘটক, হোয়াট ডু য়্যু সাজেস্ট?

—আমি আর কী বলবো ফাদার!—পুরো ছেড়ে দেওয়া গলায় ভদ্রলোক বললেন। তাঁর নাম জানি না, পদবী ঘটক বুঝতে পারলাম। তিনি আবার বললেন—তবে, মা জননী যখন বলছেন, চলুন সকলে মিলে একবার যাওয়া যেতে পারে।

—দ্যাট্স ফাইন। লেট অল অফ্ আস্ গো।—ছেলেটি মাঝখান থেকে কথা বলে উঠলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই পাশ থেকে মেয়েটি যেন সামান্য ভ্রূ কোঁচকানো শাসনের সুরে তাকে ধমক দিলো।—য়্যু কিপ কোয়ায়েট।

বুঝতে পারলাম নিঃশব্দে তাদের মধ্যে চোখে চোখে একটি ছোট্ট খুনসুটি হয়ে গেল। কিন্তু আমি এই মুহূর্তে কোনো কথাই আর

বলতে পারছি না। নানান রকম ভাবনা আমার মাথার মধ্যে পাক খাচ্ছে। সেই সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে পড়ার এক আকুতিও টের পাচ্ছি নিজের মধ্যে। গোলমাল শুনে বুঝতে পারছি আরও হাজার হাজার তীর্থযাত্রী এসে পড়েছেন এই কয়েক ঘণ্টায়।

সাহেব নিজেই বললেন—বেশ। সেটাই সব থেকে ভালো। সকলেই যাই। চলুন, লেটস্ গো।

সকলে যেন তৈরিই ছিলেন। আমি হাতের ব্যাগ নিয়ে দু-এক পা এগোলাম। পুরো দলটাই পিছনে চললেন।

কোয়ার্টার্স কম্পাউণ্ড থেকে বেরুবার সময় গেটে সেই নেপালী দারোয়ান খুব অবাক চোখে আমাদের দিকে তাকালো। বোধহয় ঠিক ধরতে পারেনি, আমরা কি করতে যাচ্ছি। আমি তার দিকে তাকিয়ে পরিষ্কার বাংলাতে বললাম—দারোয়ানজী, আমরা একটু পরেই আবার সব আসছি।

উঠে দাঁড়িয়ে হেসে ঘাড় নাড়লো দারোয়ান।

শীতের ছোটবেলা পড়ে আসছে। রোদের তেজ একদম কমে গেছে, তবু বালিতে গরম ভাব। খালি পায়ে হাঁটতে বেশ আরাম লাগছে। কিন্তু মেলার চেহারা অনেক পাল্টে গেছে। কোয়ার্টার্স থেকে মেলা অফিস পৌঁছাতে পাঁচ সাত মিনিট লাগার কথা। কিন্তু আপাততঃ শুধু ভিড়ের জন্যই দশ মিনিটের মধ্যে অর্দ্ধেক রাস্তা পৌঁছতে পারিনি।

অভাবনীয়ভাবে বেড়েছে তীর্থযাত্রীর সংখ্যা। ঠেলাঠেলি চিৎকার ব্যস্ততা মাইকের শব্দ সবই বেড়েছে। দলে দলে জনস্রোত এসেই চলেছে এবং তাঁরা দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য। মুহূর্তের মধ্যে এক একটি গোল বেঁধে যাচ্ছি। মাথার বোঁচকা উল্টে যাচ্ছে, কেউ দূরে ছিটকে যাচ্ছে। নিজের লোককে ডাকার জন্য চিৎকার।

আমি এগিয়ে এসেছি খানিকটা। অবস্থাটা যে এমন দাঁড়াতে পারে মাথায় আসেনি আগে। পিছনে তাকিয়ে দেখি, ও'রা যেন এক কঠিন

সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজেদের টেনে আনছেন। আমি তাকাতেই পাদ্রীসাহেব গলা ফাটিয়ে আমার থেকে মাত্রই কয়েক গজ দূরে থেকে বললেন—আপনি এগিয়ে চলুন, উই আর ফলোয়িং।

ভিড়ের মধ্যে টাল খেতে খেতে হাঁটছি। কিন্তু মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে পুরো অন্য ভাবনা। নানা প্রশ্নের ঘূর্ণাবর্ত। বড় অদ্ভুত দলটি। কি উদ্দেশ্যেই বা এসেছেন ওঁরা! তীর্থ করতে? পুণ্যার্জন? ওঁদের পারস্পরিক সম্পর্কটাই বা কী, কেমন! নিঃশব্দে কৌতূহল আমার ভিতরে বেড়েই চলেছে। না, খারাপ লাগছে না আমার। বিশেষতঃ ওঁদের কথাবার্তার মধ্যে এমন এক টান রয়েছে, সত্যি বলতে একটু জমিয়ে কথাবার্তা বলতেই মনে মনে ইচ্ছে জাগছে। থাকাটা এমন কিছু বড় ব্যাপার নয়, কতোক্ষণই বা আর ঘরে থাকবো! কিন্তু একটু অন্য ধরনের মানুষজনের সঙ্গে গল্প করা আড্ডা দেওয়ার প্রলোভন টুকু বা কম কীসে! বিশেষ করে, আমার সম্পর্কে ওঁদের যখন কোনো বিরূপ মানসিকতা রয়েছে বলে এখনও মনে হচ্ছে না।

মেলা অফিসে ঢুকতে না ঢুকতেই দেখি, সেই ভদ্রলোক, যিনি আমাকে সরকারী আবাসের ঘর ঠিক করে দিয়েছিলেন। আমাদের দেখে ব্যস্তভাবে নিজেই এগিয়ে এলেন।

—আয়াম এক্সট্রিমলি সরি, বাট হেল্প্‌লেস। ভদ্রলোক নিজের দু'-হাত জোড় করে বললেন।—এক্ষুণি যাচ্ছিলাম আপনাদের ওখানে। ওঁদের পাঠাবার পরেই মনে হলো আপনারা কনফিউজড হ'য়ে যাবেন।

পুরো দলটিই আমরা কাছাকাছি। ভদ্রলোক আবার বললেন—এতো লোক যে একসঙ্গে এসে পড়বেন আমরাও কল্পনা করতে পারিনি। আপনারা একটু কষ্ট করে ম্যানেজ করে নিন ভাই। দেখছেন তো অবস্থা।

আমি বললাম—আমার কিন্তু এমন কিছু অসুবিধা নেই। রাত্তিরে কিছুক্ষণ শোওয়া ছাড়া আমার ঘরে থাকারও বিশেষ প্রয়োজন নেই।

ভদ্রলোক পাদ্রীসাহেবের দিকে তাকালেন। বললেন—মিস্টার ম্যাথুজ, আপনাদের কিন্তু ওই একটা কোয়ার্টার্স-ই শেয়ার করে নিয়ে যাহোক করে থাকতে হবে, নয়তো কোনো উপায় নেই।

সাহেব যেন খানিকটা মনে মনে তৈরিই ছিলেন। বললেন—থ্যাঙ্ক য়ু্য। আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না। তাছাড়া পাশে একটি ঘর তো রয়েছেই।

আমার দিকে তাকিয়ে সাহেব একই সঙ্গে আমাকে এবং মিস্টার ঘটককে বললেন—আমরা ছেলেরা একটা ঘরে থাকবো, পাশের ঘরে রুযোশেফ আর বেলা। আপনার কী মনে হয় ?

আমি আবার বললাম—আপনাদের অসুবিধা না হলে আমার কোনো প্রবলেম নেই।

—ব্যস্, তাহলে তো সব মিটেই গেল।—দেখি সেই মহিলা এগিয়ে এসেছেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—আমরা এসেই আপনাকে বিপদে ফেললাম। উড়ে এসে জুড়ে বসে গেলাম।

আমি হাসলাম। বললাম—আমি কিন্তু মোটেই তা ভাবছি না।

বেশ কিছুক্ষণ থেকেই অনুভব করছি, একটি ধোঁয়া ওঠা টলমলে সোনালি তরলের জন্য ভেতরটা হাঁকপাক করছে। ঘরের একটা কিছু বন্দোবস্ত না হওয়া পর্যন্ত এতোক্ষণ কিছু বলতে পারছিলাম না। এবার সব ঠিকঠাক হয়ে যাওয়ায় মনে হলো এখন আমার ঘরে ফিরে কাজ কী! ওঁরা নিজেদের মধ্যে কিছু কথাবার্তা বলছেন। আমার অবশ্য একটু আগে থেকেই মনে হচ্ছিল মিস্টার ঘটক বলে ওই ভদ্রলোক যেন একটু ম্রিয়মান হয়ে পড়েছেন। কথাবার্তা বিশেষ বলছেন না। পাদ্রীসাহেব এবং বেলা নামের মহিলা কথা বলছেন।

বেরিয়ে আসছিলাম সকলে একসঙ্গেই মেলা অফিস থেকে। রাস্তার জনসমুদ্রে ভাসবার আগে পাদ্রীসাহেবকে বললাম—আপনারা তাহলে যান ঘরে। আমি একটু ঘুরে বেড়িয়ে আসি।

আমার মনের কথা সাহেব টের পেয়েছিলেন কী না জানি না।

হঠাৎ নিজের থেকে বললেন—চলুন না, আপনার আপত্তি না থাকলে আমিও একটু ঘুরে আসি।

এটাই তো চাইছিলাম। বললাম—না, না আপত্তির কী আছে! আপনি সঙ্গে এলে আমার ভালোই লাগবে।

ওঁদের বাদবাকী সকলের দিকে তাকিয়ে আবার যোগ করলাম—আপনারা সকলেই আসতে পারেন ইচ্ছে হলে।

উত্তর দিলেন সাহেব।—ওরা সকলেই বেশ ক্লান্ত। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে তারপর না হয়…

—সেই ভালো।—ভদ্রমহিলা উত্তর দিলেন আমার দিকে তাকিয়ে। —আপনারা বরং ঘুরে আসুন।

ভদ্রমহিলার কথা বলার ধরনটা এমন লাগল যেন আমরা সব একই পরিবারের লোক এখন। অথচ ব্যাপারটা একটু আগে প্রায় এমন দাঁড়াতে যাচ্ছিল যেন একদিকে আমি আর একদিকে ওঁরা সকলে-মিলে, আমরা দুটি বিরুদ্ধ পক্ষ। একই ঘরের দুজন পৃথক দাবীদার। সমাধানটা যেন খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবেই হয়ে গেল। বাঁচা গেছে।

আমরা সবে অন্যদিকে ঘুরতে যাবো, সাহেব বললেন—আপনার প্রয়োজন না থাকলে ব্যাগটি কিন্তু দিয়ে দিতে পারেন।

ঠিকই তো। এতোক্ষণ যেন একটি অভ্যাসের মতোই ব্যাগটি সঙ্গে নিয়ে ঘুরছিলাম। অহেতুক সঙ্গে বোঝা নিয়ে বেরুবার কোনো মানে হয় না। থাকার বলতে তো, একটি কম্বল, জুতো জোড়া, একটা টুথ ব্রাশ, তোয়ালে আর গোটাকয়েক কমলালেবু। সুতরাং খোয়া যাওয়ার আশংকাও তেমন নেই। তবু অন্য কেউ একজন আমার ব্যাগটি বয়ে নিয়ে যাবে, এই সংকোচ থেকেই বললাম—না, প্রয়োজন কিছু নেই। তবে আবার একজন এটা....

আমাকে শেষ করতে না দিয়েই পাদ্রীসাহেব হাত বাড়িয়ে ব্যাগ নিলেন।—দিন, দেখি।

ছোট ছেলেটির দিকে ব্যাগটি বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—যোশেফ, কিপ ইট উইথ য়্যু। ক্যারি ইট টু দ্য রুম মাই বয়। মিষ্টার ঘটকের দিকে তাকিয়ে বললেন—মিষ্টার ঘটক, আমরা তাহলে একটু ঘুরে আসি, য়্যু গো এ্যান্ড টেক রেষ্ট্।

ঘটকবাবু একবার সাহেব আর একবার আমার দিকে তাকালেন, যেন কিছু বলি বলি করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই না বলে শুধু আচ্ছা বলে একটা শব্দ করে ঘুরে গেলেন।

সাহেব আমাকে বললেন—চলুন, লেটস্ গো দিস ওয়ে।

বুঝতে পারছি আমার ভাবনার পালে অন্য এক ধরনের বাতাস লেগেছে। অদ্ভুত এই দলটি সম্পর্কে ক্রমাগতই আমার কৌতূহল প্রবলতর হয়ে উঠছে। জানতে ইচ্ছে করছে ওঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক। কেনই বা এমন একটি পরিবার সদলবলে গঙ্গাসাগরে! কিন্তু আপাতত কিছুই জিগ্যেস করার সুযোগ নেই, যতোক্ষণ না পর্যন্ত কোথাও একটু বসার সুযোগ পাচ্ছি। সেই সঙ্গে অবশ্যই অনধিকার চর্চা করে ফেলার আশংকাও রয়েছে। তবে, নামগুলো এ পর্যন্ত যা কানে বেজেছে, তাতে ওঁরা যে খ্রীশ্চান তা বুঝতে পেরেছি। একমাত্র মিষ্টার ঘটক এবং ওই মহিলা সম্পর্কে আমি কিছুই ধরতে পারছি না। মনে আছে, মিষ্টার ঘটক একবার ওই মহিলাকে 'মা জননী' সম্ভাষণে কথা বলেছিলেন। পাদ্রীসাহেব ফাদারের দেখলাম চোখের তারা নীল, মাথার চুল লালচে, আবার গায়ের রং আমাদের মতো। সত্যি বলতে কী, আমার কাছে সবচেয়ে বেশি রহস্যে ঢেকে রয়েছেন ওই মহিলা। একই সঙ্গে সৌন্দর্য ব্যক্তিত্ব ভালবাসা করুণায় মেশামেশি ওঁর চেহারায় এক দারুণ স্বাতন্ত্র। ফাদার কথা বলেন একটু আস্তে টেনে এবং মাঝে মধ্যেই শুদ্ধ শব্দ ব্যবহার করেন।

সাগর দ্বীপে আঁধার নামার প্রস্তুতি চলেছে। বোঝা যায় সেই সঙ্গে জনসমাগমও তুঙ্গে উঠেছে। শেষ মুহূর্তের যাত্রীরা সব এসে পড়ছেন। প্রচুর মার্কারি আর নিয়ন আলো জ্বলে উঠেছে। যত্রতত্র ধোঁয়া উঠতে

শুরু করেছে, অধিকাংশ চা খাবারের দোকান আর হোটেল থেকে। খোল করতালের আওয়াজের সঙ্গে মিশেছে মাইকের চিৎকার এবং কীর্তনের নামে একটি বেসুরো হট্টগোল।

জল-তরঙ্গোচ্ছ্বাসে সবে ভেসে পড়েছি সাহেবের সঙ্গে। হয়তো আর একটু হলেই হারিয়ে যেতাম ভিড়ের মধ্যে, কিন্তু তার আগেই পিছন থেকে গলা শুনলাম—এই যে শুনছেন, দাঁড়ান, দাঁড়ান এক মিনিট। চেনা গলা শুনে দাঁড়িয়ে পড়লাম। দেখি এপাশ ওপাশ জনস্রোতের ভিড় ঠেলে আসছেন মিষ্টার ঘটক। সঙ্গে বোধহয় যোশেফ নামের ছেলেটিও।

কাছে আসতেই দেখি লম্বা চওড়া চেহারা রুক্ষ চুল রং জ্বলা সোয়েটার গায়ে দেওয়া সেই ভদ্রলোকের চোখের দৃষ্টি অন্যরকম। ঠেলাঠেলি করে কোনোমতে রাস্তার একটু ধারে এলাম। তার মধ্যেই মিষ্টার ঘটক তাঁর বড় বড় হাতের পাঞ্জায় ধরে ফেলেছেন আমার দুখানা হাত। অতবড় মানুষটা যেন একটি শিশু। ভালো করে কথা বলতে পারছেন না, অনুশোচনায় তাঁর কণ্ঠস্বর বাষ্পরুদ্ধ।

ওই ভিড় ঠেলাঠেলি আর আলো আঁধারির মধ্যে একটি মুড়ি তেলে-ভাজার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি আমাকে বলছেন—আপনাকে আমি অপমান করেছিলাম, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। নয়তো এই পুণ্যতীর্থে আসা আমার মিথ্যে হয়ে যাবে। আমি অনেকক্ষণ ধরে বলি বলি করেও…

কী করে বোঝাবো এই মুহূর্তের যে সংকট! আমিই যেন বোকা হয়ে তাকিয়ে আছি।

তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ও'র একটা হাত ধরলাম।—বললাম—ছি ছি এ আপনি কী বলছেন! আপনি মোটেও আমায় অপমান করেন নি। আমি কিছুই মনে রাখি নি। আপনি আমার বয়ো-জ্যেষ্ঠ…

অকস্মাৎই সাহেবেরও হাত ধরেছেন।

—ফাদার, আপনি আমাকে ক্ষমা করেছেন তো! আপনি রুষ্ট হয়েছিলেন আমার প্রতি—।

সাহেব হাত রেখেছেন ঘটকবাবুর পিঠে। হাজার গোলমালের মধ্যেও শুনতে পাচ্ছি তিনি বলছেন—মিষ্টার ঘটক, য়্যু আর গ্রেট। মঙ্গলময় ঈশ্বর আপনার কল্যাণ করুন। যান, আপনারা ঘরে যান।

ঠিক এই সময়েই দেখি হঠাৎ যোশেফ বলে সেই ছেলেটি আবার আমায় ধরেছে। তারও চোখ ছলছল। ঠোঁট কাঁপছে।

—য়্যু ডেফিনিট্লি ফেল্ট ইনসালটেড দ্যাট টাইম। আমায় ক্ষমা করুন।

আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম সেই প্রথম ঘরে ঢোকার পর ওঁরা কে কী বলেছিলেন। কিন্তু এখন আবার নতুন করে এই ধারাবাহিক ক্ষমাপ্রার্থনায় ভীষণ অস্বস্তি হতে লাগলো।

ছেলেটির মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললাম—ঠিক আছে, আমি কিছু মনে করিনি।

ফাদার-ও যোশেফকে কাছে টেনে একটু আদর করে দিয়ে বললেন—দ্যাটস অল রাইট। তোমরা ঘরে যাও। ভিড়ের মধ্যে পিষে ধাক্কা খেতে খেতে চলেছি। কোনো দোকানের বেঞ্চিতেই জায়গা নেই। রাস্তা বলেও এখন আর কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে না। সাহেব আসছেন পিছনে। ঘটকবাবু আর ছেলেটির আবরণ বড় অদ্ভুত। স্থান কাল পাত্র সবই ভিন্নরকম তবু, ব্যাপার সেই একই সাংসারিক কান্নাহাসির টালবাহানা। প্রাথমিক তাচ্ছিল্য আর অপমানে যাদের ঠোঁট বেঁকে উঠেছিল, মাত্র কিছু সময়ের ব্যবধানে তাঁদের অন্তরেই অনুশোচনার সুললিত ফল্গুধারা। আত্মগ্লানিতে অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত ছুটেই এলেন আবার ক্ষমাটুকু চাওয়ার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে আমিও কী বাঁধা পড়ে গেলাম না এক হৃদয়ের টানে!

অস্বাভাবিক ভিড়ের চাপ আর কোলাহলে মাথা ঝিমঝিম করছে। একটি চা-এর দোকানের বেঞ্চিতে সামান্য ফাঁকা জায়গা দেখামাত্র

ফাদারের হাত ধরে টানলাম—এদিকে, এইখানে আসুন।

দম ফেলে কোনোমতে দুজনে বসলাম। রুমালে মুখ মুছে মুড়ি জিলিপি আর চা খেতে খেতে টুকটাক গল্প চললো। সচেতনভাবে চিন্তা করলে এ সত্যি এক অদ্ভুত ঘটনা। এক পাদ্রীসাহেবের সঙ্গে বসে চা খাওয়ার ঘটনা আমার জীবনে ঘটার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু জীবন এমনই এক বিচিত্র বিস্তৃত ব্যাপার যা অনেক সময়ই ছকে বাঁধা পরিস্থিতি পদ্ধতি অতিক্রম করে যায়। দেখতে পাচ্ছি হুটহাট বেরিয়ে পড়লে এমন সব উল্টোপাল্টা ব্যাপার দিব্যি ঘটে যায় মানসিক প্রস্তুতি ছাড়াই। হয়তো সেইভাবেই মনের বন্ধ দরজা-জানালা ঘুলঘুলিগুলো খুলে গিয়ে আলো বাতাস প্রবেশ করে অজান্তেই। পরে অনুভব করি বেশ ঝরঝরে লাগছে কয়েকটা দিন অন্যরকমভাবে কাটিয়ে ফেলে।

ইতিমধ্যে জেনেছি সাহেবের আসল নাম ক্রিস্টোফার ম্যাথুজ। আসানসোল-এর একটি ফিরিঙ্গি ডরমিটরি স্কুলের ফাদার। সঙ্গে ছেলে মেয়ে দুটি ও'র পালিত পুত্র এবং পালিতা কন্যা। নিজে ইনস্টিটুশনের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকেন বলে দূর সম্পর্কের আত্মীয়া বিধবা এবং শিক্ষিতা বেইলি, যার নাম আপাততঃ বেলা, তাঁকে এনে রেখেছেন কাছে। ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করা ছাড়াও বেলা মেয়েদের হস্টেলের মিস্ট্রেস। ঘটক ফাদারের প্রাইভেট সেক্রেটারি থেকে আরম্ভ করে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেরও অনেক কিছু দেখাশোনা করেন। কথা বলতে বলতে ফাদার নিজেই বললেন—জানেন, ঘটকের নিজস্ব জীবন খুব অশান্তির ছিল। ওর কোনো সন্তানাদি হয়নি, স্ত্রী ওকে ত্যাগ করে চলে যায়। ওর ব্যক্তিগত জীবনের অক্ষমতায় আপাতদৃষ্টিতে ও রূঢ়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ও একটি অতি দুঃখী হিউমান বিয়িং। ফলিডল খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টাও করেছিল।

—তাই নাকি!—গল্প শুনতে শুনতে আপনা আপনিই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল কথাটা।

মিস্টার ম্যাথুজ একটু থেমে হেসে হঠাৎ বললেন—জানেন, মনের দিক থেকেও এতো অনুদার হয়েছিল, যে দোকান থেকে ওর সমবয়সী কোনো সন্তানের পিতা আলু কিনতো, ঘটক আর কোনোদিন সেই দোকানে যেত না। আপনাকে বোঝাতে পারলাম কী ?

নিরুত্তর থেকে গেলাম মিস্টার ম্যাথুজের কথার পরেও। বেশি কী আর বুঝবো ! সে ক্ষমতাই বা আমার কোথায় ! শুধু লম্বা চওড়া চেহারা নিয়ে হম্বিতম্বি করার আড়ালে একটি চিরদুঃখী আধপাগল মানুষকেই মনে হলো দেখতে পাচ্ছি।

প্রসঙ্গটা পরিবর্তন করে একটু সময় নিয়ে বললাম—আপনি যোশেফের কথা কী বলছিলেন ?

ওহ্ গড, সে আরও সাংঘাতিক।—সাহেবকে যেন গল্পে পেয়েছে। বললেন—যোশেফ একটি কেক্ বিস্কুটের দোকানে ঝাড়ামোছার কাজ করতো। খুব দুর্ব্যবহার পেতো সেখান থেকে। কতই বা বয়স তখন ওর, আট নয়। একদিন সেই দোকানের ওনারকে পিছন থেকে লোহার রড দিয়ে মাথায় আঘাত করে। তিনি অবশ্য প্রাণে বেঁচে যান। আর যোশেফও নাবালক বলে কিছুটা নিস্কৃতি পায়। ওকে বালক অপরাধীদের জেল-এ রাখা হয়েছিল এবং বিচারে প্রমাণিত হয় ওর মধ্যে খুন করার প্রবণতা রয়েছে। আমি নিজের দায়িত্বে ওকে ডরমিটরিতে নিয়ে আসি মানুষ করবো বলে।

মোহিত হয়ে শুনছিলাম ফাদারের গল্প। বললাম—তারপর ?

—ওই তো দেখলেন।—সাহেব বললেন—দ্রুত রেগে যায় হয়তো কিন্তু ক্রমশই ওর মধ্যে অনুতপ্ত হওয়ার মানসিকতা গড়ে উঠছে। নিজে থেকে আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলো এসে। আমরা কখনও রাগ করে কথা বলিনা ওর সঙ্গে। এখনও নাইন্টি পার্সেন্ট স্বাভাবিক সুস্থ। শুধু তাই নয়, যোশেফ খুব মেধাবী ছাত্র। ওর মধ্যে স্বাভাবিক ইমোশন ডেভেলাপ করেছে অনেক।

একটু থেমে আবার যোগ করলেন—অবশ্য এর অনেকটা কৃতিত্বই

বেল্লার। বেলা ওর পড়াশুনায় সঙ্গেই যীশুর বাণী রামায়ণ মহাভারত পড়ায়। এখনও শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার বর্ণনা পড়ার সময় ওর চোখে জল আসে।

মনে হচ্ছে আশপাশের পরিবেশ থেকে সরে গেছি অনেক দূরে। বিচিত্র জীবনের আখ্যান শুনছি। এসেছি গঙ্গাসাগরের মেলায়, ডুব দিচ্ছি মানব মনের গহীন গাঙে। কিন্তু গৃহস্থ বাঙালী মন আমার, কৌতূহলের নিবৃত্তি হয় না সহজে। মিষ্টার ম্যাথুজ স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গী হয়েছেন। গল্প করতে করতে বলেও ফেললেন এটা ওটা নানান কথা। কিন্তু কেবলই মনে হচ্ছে সাহেব যেন নিজের অনেকটাই ওই সাদা আলখাল্লা কোটের ভিতরে ঢেকে রেখেছেন। অথচ নিজের থেকে খুঁটিয়ে কিছু জানতে চাওয়াটাও আমার সৌজন্যের পরিচয় হবে না।

চা-এর দাম মিটিয়ে উঠে আসছিলাম। হঠাৎ হেসেই জিগ্যেস করলাম —তা আপনারা সব গঙ্গাসাগরে কেন?

—দ্য সেইম কোয়েশ্চেন আই ওয়াজ গোয়িং টু আস্ক্ য়্যু।

মিষ্টার ম্যাথুজ হাসতে হাসতে আমার হাত ধরলেন।

—তীর্থে আসার উপযুক্ত বয়স তো আপনার হয় নি। তবে?— একটু থেমে নিজ থেকেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো করে আবার বললেন—অবশ্য সে উত্তর আপনার নিজের কাছেও কতখানি স্বচ্ছ তাতে সন্দেহ আছে।

দোকান থেকে বেরিয়ে আসছিলাম। কিন্তু এতো অসম্ভব ভিড় যে মনে হলো মুহূর্তে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবো। মরিয়া হয়ে একটু জোরে বলে ফেললাম—আমার প্রশ্নের উত্তরটা কিন্তু পেলাম না।

মিষ্টার ম্যাথুজ কয়েকজনকে কাটিয়ে আমার কাছে আসার চেষ্টা করলেন। অনেকে তাকিয়ে দেখছেন ওঁর দিকে। হয়তো ওঁর পরিধানই তার জন্যে দায়ী। একটু চাপা গলায় আমার কানের কাছাকাছি মুখ এনে কিছুটা অসহায় ভাবেই যেন বললেন—কেন, উত্তরটা

আপনি নিজে পাচ্ছেন না? আমার দিকে ভালো করে একবার তাকিয়ে দেখুন না।

আমি যেন কিছুটা আচ্ছন্ন। চারপাশ থেকে ঠেলা আর ধাক্কায় নিজেকে ঠিক মতো দাঁড় করিয়ে রাখতে পারছি না। তার ওপর গোলমালে কান ঝালাপালা। এই অবস্থার মধ্যেই একটি রহস্য আবরণ উন্মোচিত হওয়ার অপেক্ষায় প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা নিয়ে ঝুলে আছে। মিষ্টার ম্যাথুজের গলায় অন্য ধরনের এক আওয়াজ যেন দূর থেকে এসে ঢুকছে আমার কানে।

—আমি তো না হিন্দুর গাভী, না মহাভারতের শূকর। জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই তো জানি, আমি কারো কেহ না। সাহেবের গলা আবেগে কাঁপছে। আমিও স্থির ভাবে ওঁর চোখের দিকে তাকাতে পারছি না। উনি বলছেন—যেখানে মহামানবের মিলনক্ষেত্র আমি সেখানেই যাই। ঘুরে বেড়াই। মনুষ্য জন্মের আইডেণ্টিটি খুঁজি।

শেষের কথাগুলি বলতে বলতে জনসমুদ্রের ঘূর্ণীতে মিশে গেলেন মিষ্টার ম্যাথুজ। স্থির নিশ্চল হয়ে রয়েছি আমি, ওঁকে এখন ধরতে পারবো সে আশা করি না। উন্মত্ত উত্তাল অগণিত মানুষ এই মুহূর্তে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য। তার মধ্যেই সাহেবের কথাগুলো মাথায় আমার প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে। ভদ্রলোক তাঁর এই পঞ্চাশ বছর বয়সেও হন্যে হয়ে ঘরে বেড়াচ্ছেন জীবনের সবচেয়ে জরুরী ঠিকানাটি খুঁজে পেতে। মনুষ্যত্বের ঠিকানা। তাঁর চেহারায় আমি আগেই প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্যের সহাবস্থান লক্ষ্য করেছি। জানি না, হয়তো এই তাঁর অভিমান যে ব্যবহারিক পৃথিবী ওঁর দো-আঁশলা মনুষ্যজন্মকে স্বীকৃতি দেয় নি। যন্ত্রণাবোধ ওঁকে কুরে কুরে খাচ্ছে। ছুটিয়ে নিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। হয়তো সেই যন্ত্রণাবোধ থেকেই মানুষ করে তোলার ব্রত নিয়েছেন এমন সব মানুষদের, যারা প্রায় অমানুষ হিসাবে সমাজে চিহ্নিত হতে চলেছেন। তবু রেহাই পান নি নিজের কাছ

থেকে নিজে। ছাই চাপ আগুনের মতোই ক্ষোভ আর অভিমান প্রতিনিয়ত ধিকি ধিকি জ্বলছে বুকের ভিতরে।

অন্ধকার নেমেছে গাঢ় হয়ে। উত্তরের বাতাস বিঁধতে শুরু করেছে গায়ে।হাতে ঘড়ি নেই তাই সময় ঠাহর করতে পারি না।লম্বা কোট চাপিয়ে নিলাম গায়ে। গোটানো প্যাণ্ট নামিয়ে দিলাম পা পর্যন্ত। বালি বেশ ঠাণ্ডা হয়েছে, তবু নরম বালির ওপর খালি পা ফেলতে খারাপ লাগছে না।

লোকজন পুণ্যার্থীদের ভিড়কে এখন আর ঠিক কি ভাবে ব্যাখ্যা করবো জানি না। সামান্য জায়গার মধ্যেই হাজার হাজার মানুষ, তাদের মালপত্র বাক্স পোঁটলা নিয়ে হিমশিম খেতে খেতে চলেছেন। হিসেব নেই কে কোথায় কোন্ দিকে চলেছেন।যে কোনো দুটো রাস্তা মিশেছে যেখানে সেখানেই এক ভয়াবহ তালগোল পাকানো অবস্থা। উত্তাল তরঙ্গের মতো দলে দলে মানুষের মাথা এক জায়গায় এসে মিশছে।পর মুহূর্তেই তারা দিশেহারা, নিজের লোক হারিয়ে যাচ্ছে, বাচ্চা কাঁদছে। রাস্তায় নেমে পড়েছি আমিও। বালিতে পা বসে যাচ্ছে। ভেবেছিলাম একটু ভিড় বাঁচিয়ে যাবো। কিন্তু ঠিক তার উল্টোটাই হলো। যে দিক দিয়ে পাশ কাটিয়ে বেরুতে যাবো, ঠিক সেই দিক থেকেই হঠাৎ একটি বিশাল দঙ্গল হুড়মুড় করে এসে মিশে গেল আমাদের স্রোতে।একেবারে হাঁপিয়ে ওঠার দশা।কিন্তু বুঝতে পারছি কোনো দিকেই আপাতত আর বেরুবার সুযোগ নেই। যেন কয়েক হাজার মানুষে মালপত্রে একটি চাক বেঁধে গেছে। ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি ধস্তাধস্তি করে পরিত্রাণ পেতে চাইছে সকলেই। এক ভয়ংকর চেহারা নিয়েছে পুরো জায়গাটা। সাংঘাতিক চিৎকার চ্যাঁচামেচি আর টানাহ্যাঁচড়া চলছে। বুঝতে পারলাম কার একটি গোরু হারিয়ে গেছে ওই জটলার মধ্যে। আর সে উন্মত্ত পাগলের মতো ঠেলাঠেলি লাফঝাঁপ শুরু করেছে এবং কান্না জুড়েছে—মেরা

গাই কিধর চলি গই! সুযোগ বুঝে মড়াকান্না কাঁদতে কাঁদতে একটি কুষ্ঠরোগীও কিভাবে আটকে পড়েছে তার ভিতর। ফলে গা বাঁচানোর জন্য অনেকে আবার প্রায় মারমুখী হয়ে ঠেলে বেরুতে চাইছে। কার মাথা থেকে বোঁচকা উলটেছে, কোন্ বাচ্চা হিসি করে ফেলেছে। মুহূর্তের মধ্যে মনে হলো গঙ্গাসাগরে আসার চরম প্রাপ্তি হয়ে গেল এবার। কপালে গলায় রীতিমত ঘাম বেরুচ্ছে দরদরিয়ে, গা হাত পায়ে যেন জোর কমে আসছে। শুধু মাথা উঁচু করে শ্বাস নিতে চাইছি। ভাগ্য ভালো ছিল। বেশিক্ষণ সেই অবস্থায় থাকতে হয় নি। খুব দ্রুত কিছু স্বেচ্ছাসেবক ও পুলিশ সেখানে এসে পড়ায় ভিড় অপেক্ষাকৃত পাতলা হয়ে গেল। কোনোক্রমে প্রাণ নিয়ে সরে এসে ধুঁকতে লাগলাম একটি শাল খুঁটিতে হেলান দিয়ে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এতো চট্ করে এরকম একটি জমাট ভিড় হয়ে যাওয়ার পিছনে কিছু অদৃশ্য হাত এবং বিশেষ উদ্দেশ্য আছে।

একটু জিরিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে শুরু করলাম। মোটামুটি কয়েকটি নিশানা এবং দিকের হিসাবে মনে হলো উত্তর পশ্চিম কোণ বরাবর চলেছি। কিছু কিছু জায়গায় যথেষ্ট আলোর বন্দোবস্ত থাকায় বেশ ঝলমল করছে। হোগলার ঘর তৈরি হয়েছে হাজার হাজার। ঘরের নিচু নিচু ছাদ। মানুষের মাথার পরেই চোখে পড়ে হোগলার ঘরের ছাউনি। পুরো সাগর দ্বীপটিকে এখন একটি হোগলানগরী বলা যায়।

উত্তর প্রান্তে মেলার শেষদিকে পাশাপাশি একটানা অস্থায়ী বাসস্থানের ঘেরা দেওয়া। হাঁটতে হাঁটতে সেদিকে যেতে গিয়ে চোখে পড়লো হাসপাতাল দমকল সরকারি অফিস ডাকঘর কয়েদ-খানা আদালত সবই আছে। যদিও অস্থায়ী, তবু বানানো হয়েছে তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটানোর জন্যই বোধ করি।

কাছাকাছি আসতে মনে হলো একটি নোংরা ঘিঞ্জি জল প্যাচপেচে বস্তীর মুখে এসে পড়েছি। ছোট ছোট নীচু পাশাপাশি একটানা

ঘর। মুখোমুখি দু'দিকের ঘরের মাঝখানে সরু রাস্তা। হেন কাজ নেই যা ওখানে হচ্ছে না। বাসন ধোওয়া প্রাকৃতিক কাজ পুজো-আর্চা নামগান ভাত রান্না মশলা পেষা সব কিছু।

কোনো একটি ঘরের মধ্য থেকে কীর্তনজাতীয় সুর এবং ঘন ঘন হুলুধ্বনি ভেসে আসছিল। সঙ্গে শাঁখের আওয়াজ ঘন্টাধ্বনি। কৌতূহলবশতঃ ঢুকে পড়লাম সরু রাস্তার ভিতর। ভিজে বালির ওপর কুটনোর খোসা নোংরা জলেব ছড়াছড়ি। আলো বেশ কম। তেরছা এসে পড়েছে একটু দূরের রাস্তার মার্কারি ল্যাম্প থেকে। কিন্তু পুরোটা যেতে পারলাম না সেই রাস্তা দিয়ে। তাব আগেই ভিড় এবং রাস্তা বন্ধ। রীতিমত ঔৎসুক্য নিয়েজটলা করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ঐসব ঘরেরই বাসিন্দারা মনে হলো। কী ব্যাপার! এপাশ ওপাশ এতো জ্যাম কেন!

ফাঁক ফোকর দিয়ে যতোটা পারলাম এগিয়ে ঢুকে গেলাম। দেখি—বাটনা বাটা শীল-এর মতন একটি পাথরের ওপব দাঁড়িয়ে রয়েছেন শ্মশ্রুগুম্ফ বাবরিধারী এক স্বাস্থ্যবান মাঝবয়সী দীর্ঘ পুরুষ। চেহারা ভাবভঙ্গি গোঁফদাড়ি সব মিলিয়ে এঁদের কোনো বাবা অথবা তথাকথিত গুরু বলে আমাদের মনে হয়। মনের কথা বলেই ফেলি, আমার এখনও এ ধরনের বাবা কিংবা গুরুদের জলজ্যান্ত চোখের সামনে দেখেও বিশেষ কোনো ভক্তিভাব উদয় হয় না। উল্টোটাও সত্যি যে অহেতুক অশ্রদ্ধার মানসিকতাও তৈরি হয় না। ওঁরা আছেন ওঁদের মতন, আমি আমার মতো। কিন্তু এই মুহূর্তে অনেকটা কাছ থেকে যে বাবাকে দেখতে পাচ্ছি, বলতে কী ইচ্ছে করছিল···থাক্।

কী দেখলাম, তাই বলি।

বাবার সারা অঙ্গে শুধুমাত্র নাভীর নিচে থেকে উরুর মাঝামাঝি পর্যন্ত এক ফালি গেরুয়া কাপড় ছাড়া আর কিছু নেই। পিছন এবং পাশ থেকে তাঁর পেশী গায়ের লোম ইত্যাদি দেখে যথেষ্ট তাগত

আছে বলেই মনে হয়। তার চোখমুখের চেহারা ঢাকিতে যেটুকু দেখতে পেয়েছি তাতেই ধরে নেওয়া যায় এই ঠাণ্ডায় প্রায় নগ্নগাত্রে তাঁর দাঁড়িয়ে থাকার পিছনে কোনো দ্রব্যগুণ কাজ করছে। বাবার পদসেবা হচ্ছে। ভক্তিরসে আপ্লুতা জনাকয়েক মহিলা, অল্প থেকে মাঝবয়সী সধবা ও বিধবা এক নাগাড়ে উরু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত ঘসে ঘসে বাবার পা ধুইয়ে দিচ্ছেন। তাঁর একহাতে একটি বড় মোটা লাঠি। বালির মধ্যে সেটাকে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে তিনি শিহরণানন্দ উপভোগ করছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, নাকি আমার জীবিকা সচেতন দৃষ্টির অপরাধ—পুরুষ মানুষের অনিবার্য স্পর্শ-কাতর শারীরিক পরিবর্তনটি সামান্য ন্যাকড়ার আড়াল সত্ত্বেও পরিষ্কার আমার চোখে ধরা দিলো। আর এ পরিবর্তন যে একটানা ললনাকুলের হস্ত চালনার তাড়না—আমার বিবেচনা তাই বলে। গুরুদেব দাঁতমুখ চেপে মাঝে মধ্যে চুপ করে রয়েছেন আবার মাঝে-মধ্যে কিছু মন্তব্যও করছেন। সে ভাষা অবশ্য আমার কানে আসার উপায় নেই।

কিন্তু এ দৃশ্যও দাঁড়িয়ে দেখতে আমার রুচিতে বাধে। নিঃশব্দে কয়েকজনের পাশ কাটিয়ে সেই অপেক্ষাকৃত নিরালা আবাস ঝাপসা অঞ্চল ছেড়ে চলে এলাম। অনুমানে এরপরে মনে হচ্ছিল রকমফেরে এরকম আরও অনেক বিকৃত দেহলীলা ওখানে তীর্থক্ষেত্র পুজা-পার্বনের নাম ভাঁড়িয়ে অবাধে চলছে। প্রসঙ্গত বলি, পরে জেনেছিলাম ইদানীং কয়েক বছর ধরে গঙ্গাসাগর মেলা শেষ হয়ে যাওয়ার কিছু-দিন পর থেকেই কাছাকাছি হেলথ্-সেন্টার-এ বিভিন্ন বয়সের অনেক মহিলা গর্ভপাতের আবেদন অনুরোধ নিয়ে আসেন।

আমার ধারণা, এসব ব্যাপারের পিছনে কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে স্বভাব এবং অভাব দুটোই একইরকমভাবে জড়িত। গঙ্গাসাগরের মতো এমনই এক লক্ষ লক্ষ লোকের মেলায় খুব স্বাভাবিক ভাবেই তো বিভিন্ন মানসিকতার মানুষের আগমন ঘটবে এবং তাঁরা নিজেদের

রুচি প্রয়োজন এবং ইচ্ছানুসারে আমোদ আহ্লাদের খোরাক খুঁজে নেবেন। সুতরাং অন্যান্য যে কোনো মেলার মতোই এখানেও এক শ্রেণীর লোকের দিব্যি আড়ালে আবডালে মজা লুটে নেওয়ার ব্যতিক্রম ঘটবে কেন! তবু কষ্ট হয় তাদের কথা ভেবে, যাদের শরীর বিক্রীর কারণ অভাব। হয়তো বছরের এই কটি দিনের জন্য তাদের অপেক্ষা করতে হয়, খুদ কুঁড়োর সংসারে সামান্য একটু আলোর ঝিলিক দেখার আশায়। আর যাদের কারণ স্বভাব (অবশ্যই অভাবে স্বভাব নষ্ট যাদের তাদের কথা না) তাদের প্রতিও আমার এমন কিছু অভিযোগ নেই। কেননা, এটা মোটামুটি নিয়ম। যেখানে ধর্ম সেখানেই অধর্ম, যেমন, যেখানে বাঘ তার কাছাকাছি হরিণের আস্তানা। যেখানে বন্যা হয় প্রকৃতির রূপ পরিবর্তনে সেখানেই খরা। প্রাচুর্য উদারতা সততার প্রায় পাশাপাশি থাকে দারিদ্র ভণ্ডামি নোংরামি। আপাতদৃষ্টির এই বিপরীতধর্মীতার মধ্যেই প্রকৃত-পক্ষে বজায় থেকে যায় সমতা।

এলোমেলো চিন্তার সুতো বুনতে বুনতে হাঁটছিলাম। এসে পড়েছি আবার বহুজন বহু কণ্ঠস্বরের মধ্যে। আর কেন জানি না নিজেকে একটু বিচ্ছিন্ন মনে হচ্ছিল। দু পাশে এদিকটা অজস্র দোকানপাট। মনিহারী, কাঠের দোকান, লোহার বাসন ছুরি বঁটি ডেকচি কড়াই থেকে শুরু করে ঝুমঝুমি জামাকাপড় বেতের লাঠি আংটি-চুড়ি-পুঁথির মালা, গজা জিলিপি চপ চা-এর দোকান সব মিলেমিশে চিরাচরিত মেলার চেহারা। ধুলো উড়ছে ধোঁয়া উঠছে। বেচা-কেনা চলছে পুরোদমে। সাগর সঙ্গমের তীর্থযাত্রীদের যে এতো সওদা করার ছিল কে জানতো! নাকি এই সওদা করার পিছনে মন মেজাজকে ঢিলেঢালা লাগামহীন ছেড়ে দেওয়ারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়!

পাশাপাশি অজস্র হিন্দু হোটেলের ছড়াছড়ি। ভিতরে বাঁশের খুঁটির ওপর তক্তা পাতা বেঞ্চিতে বসে পড়েছেন অনেক যাত্রী। রাতের খাওয়া

সেরে নিচ্ছেন। শালপাতার ওপর সাদা গরম ভাত। ধোঁয়া উঠছে। চোখমুখ আনন্দে চকচক করছে।

একটি আলোর নিচে শাল খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসা এক কুষ্ঠ-রোগীর দিকে চোখ পড়ায় থমকে গেলাম। না, সে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত নয়। লোকটি কুষ্ঠ রোগীর ভূমিকায় অভিনয় করতে এসেছে গঙ্গা-সাগর মেলায়। তার মেক্-আপ-এর যাবতীয় সরঞ্জাম রং তুলো আঠা ইত্যাদি সবই তার সঙ্গের ঝুলির মধ্যেই রয়েছে। তার হাত পা-এর যে সব দগদগে ঘা সে সহানুভূতির পয়সা পাওয়ার জন্য বার করে রেখেছে, আসলে সেগুলো সব ভেজা তুলোর ওপর লাল এবং সাদাটে হলুদ চটচটে রং (বেচারা জানে না, কুষ্ঠ রোগে অমন ঘা হয় না) লাগানো। অবাক বিস্ময়ে দেখি, তুলো শুকিয়ে উঠে যাওয়ায় এবং রং-এর শেড ঠিক না থাকায়, সে নির্দ্বিধায় বার করেছে তার রংএর শিশি তুলো ইত্যাদি। সামান্য একটু নলচে আড়াল ভাব করে সে ঠিকঠাক করে সব লাগাচ্ছে।

দাঁড়িয়ে দেখছিলাম এক দৃষ্টিতে। সবচেয়ে মজা, লোকটির কিন্তু বিশেষ সতর্কতা নেই তার জন্য। যদিও সে জানে তার পুরো কাণ্ড কারখানা আমি দাঁড়িয়ে দেখছি। আরও অবাক কাণ্ড, মালপত্র সব গুছিয়ে ব্যাগে পুরে এবার সে নিজে থেকেই তার কোঁচকানো মুখে দাঁত ছড়িয়ে হাসলো। কামানো ভ্রূ নাড়িয়ে বললো—কী আর দ্যাখছেন বাবু !

যতোখানি বিস্মিত আমি, ততোখানিই বিব্রত এবং সামান্য পরিমানে লজ্জাও যেন আমারই দেখে ফেলার অপরাধে (!)। কিন্তু এ লোকটা যে অসম্ভব স্মার্ট ! চক্ষুলজ্জা ধরা পড়ার ভয় কিছুই নেই। তার ওপর কথা বলছে হেসে, কী দেখছি ! এক দোটানার মধ্যে ফস্ করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—একী কাণ্ড, এটা কী করছো তুমি, অ্যাঁ।

—নিজের চোক্ষেই তো সব দ্যাখলেন বাবু।

লোকটার কোনো জড়তা নেই। বিড়িতে টান দিয়ে মেক-আপ নেওয়া

কুৎসিত মুখে আবার হাসলো। আমি একেবারে থ।

একটা ছোট কায়দা করলাম। লোকটার সামনে বালির ওপর অনেক পয়সা পড়েছিল। আমি একটা চকচকে আধুলি ফেললাম তার সামনে।

জিগ্যেস করলাম—তা এটাই ব্যবসা নাকি?

—যা বলেন। আমাদের বড় দল আছে ছ্যার।—লোকটা তার চারপাশে পড়ে থাকা পয়সায় চোখ বোলালো। আবাব বললো—আটজন সাগরেদও আছে। শালারা কী কম হারামি! নুলো ন্যাংড়া সেজে নিজেরা পয়সা কামাচ্ছে আবার ঘুবে ঘুরে এসে নজর করে আমরা সামনের হাত মেরে দিচ্ছি কিনা।

কথা বলতে বলতেই লোকটি আমার ফেলা আধুলিটা টপ করে বালি থেকে তুলে ভিতরের কোন এক লুকোনো পকেটে চালান করে দিলো। তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে বললো—যান না, ঘাটের পাশে যান, দ্যাখবেন শ'য়ে শ'য়ে।

আমি বললাম—তা তুমি যে এই সামনে বসেই রং তুলো লাগাচ্ছো, লোকে যদি দ্যাখে?

লোকটা আবার হাসলো—গঙ্গাসাগর মেলায় হাজার হাজার লোক এয়েচে, দু চার পাঁচজন দ্যাখলে আর ক্ষোতি কী ছ্যার! আপনি এবার চইলে যান।

লোকটি মুড়িসুড়ি দিয়ে আমাকে আর কোনো কথা জিগ্যেস করার সুযোগ না দিয়ে গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়লো। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সে এবার সম্পূর্ণ অন্য এক ধরনের চ্যাচ্চেড়ে স্বর গলা থেকে বার করে কাতরাতে লাগলো। আধভাঙা ফ্যাঁসফেঁসে গলায়—এ বাবু উ উ, এ মাই-ই বলার সঙ্গে সঙ্গে পা নাড়িয়ে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো।

একটু আগে যে বিপরীত ধর্মীতার কথা বলেছি, এ ব্যাপারটিও যেন তারই এক উদাহরণ। ধর্ম কর্ম পুণ্য করতে যেখানে লক্ষ মানুষের

সমাবেশ,সেখানেই ধোঁকা দিয়ে রোজগার করে নেওয়ার মতো মানুষের সংখ্যাও নেহাত কম না। অনেকেই যখন ভাবের ঘোরে ভোলনাথ হয়ে রয়েছেন, একটি শ্রেণীর উদ্দেশ্য তখন সেই ভাবের ঘরেই নিখুঁত কায়দায় সিঁদ দেওয়া।

ভিড়ের মধ্যে চলতে চলতে শুনি একটি পরিচিত কণ্ঠস্বর বাতাসে ভেসে ভেসে উড়ে যাচ্ছে। বুঝলাম তথ্য কেন্দ্রের মাইক-এর যোগ-স্থাপন করা হয়েছে রেডিও-র সঙ্গে। ও'রা তীর্থযাত্রীদের অন্ততঃ একাংশকে আকাশবাণীর স্থানীয় সংবাদ পরিবেশনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। খবরের শেষদিকে গঙ্গাসাগর মেলার কথাই বলা হচ্ছে একটি আপাত দরদী কাঁপা-কাঁপা গলায় খাদের স্বরে। আবৃত্তির ঢঙে ন্যাকামি করে খবর পড়ার এই টেকনিক আমাদের খুব চেনা। কোথায় খেয়া পারাপারের ঘাটে যেন একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে। মাত্র এটুকুই বুঝতে পারলাম, পড়ার মাহাত্মে বাকীটুকু একটি অস্পষ্ট আবেগ হয়েই থেকে গেল।

খবর শেষ হওয়া মাত্র মাইক আর রেডিও-র যোগাযোগ ছিন্ন এবং প্রচণ্ড চিৎকার শুরু হয়ে গেল নিরুদ্দিষ্টের প্রতি আহ্বান। মনে হয় রেডিও-র খবর পড়ার সময়টুকুর মধ্যে অনেক আহ্বান জমে গেছে। চিৎকারের সঙ্গেই তড়বড় করে নিরুদ্দিষ্টকে ডাকা হচ্ছে।

একটি বাংলা ঘোষণাঃ মায়াদেবী, আপনি সোনাগাছি থেকে এসেছেন। আপনার সঙ্গিনী ঈশানকুমারী আমাদের তথ্যকেন্দ্রে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। আপনি যেখানেই থাকুন...

নাম শুনেও মনে হয় মায়াদেবী এবং ঈশানকুমারী রূপোজীবিনী। হাজারটা কারণ থাকতে পারে তাঁদের সেই পেশা অবলম্বনের। তবু শতকষ্ট সহ্য করে দু তিন দিনের ব্যবসা বন্ধ করে তাঁরাও এসেছেন গঙ্গাসাগর মেলায়। ভাবতে ভালো লাগলো—সাগর সঙ্গমের পুণ্য-সলিলে গা ডুবিয়ে তাঁরা হয়তো নিজেদের রাতজাগা ক্লান্ত আপাত

লাস্যময়ী জীবনের সমাপ্তি প্রার্থনা করেন। তাঁরা যেন প্রকৃত পুণ্যার্জনে বিশ্বাসী। জীবনের মিথ্যে সিঁদুর মুছে সুস্থভাবে বাঁচার জন্য হয়তো তাঁরা সকালে ভিজে কাপড়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠে এসে মন্দিরে পুজো দেবেন।

কিংবা কী জানি, হয়তো এখন আমাকে কিঞ্চিত উদার ভাবনায় পেয়ে বসেছে বলে সব কিছু সোজাপথে ভেবে যাচ্ছি। কে বলতে পারে, সোনাগাছির গণিকারা এখানে ভিন্ন স্বাদের শিকারের আশাতেই এসেছেন কী না! আহা, আমার সঙ্গে এখানে ওঁদের দেখা হলে নিঃসংকোচে কথা বলতে পারতাম। ক্ষতি কিছু নেই, তীর্থক্ষেত্র তো! স্বর্গের আগের স্টেশন।

আলোকোজ্জ্বল মেলার মাঝখানে চলে এসেছিলাম। অদূরেই আলোকিত মন্দিরের চূড়া। খোল খঞ্জনী আর বাঁশের বাঁশী বাজিয়ে গান করতে করতে চলেছে একটি ছোট্ট দল। গানের ভাষাটা ধরতে পারছি না কিন্তু শব্দোচ্চারণ এবং তার ভঙ্গিমায় অনুমান করলাম ওঁরা উড়িষ্যাবাসী। দলটির আগে আগে চলেছে একটি অবাক করা ক্ষুদ্র নীলাম্বর মানুষ। জীবনে এমন মানুষাকৃতি দেখিনি।

উচ্চতায় মেবে কেটে তিন ফুট। লিকলিকে রোগা। বয়স নাকি তার তিন দশকের ওপর। না, সার্কাস-এর বামন জোকারদের থেকে এর চেহারা একেবারে অন্যরকম। মাথাটি ছোট্ট নারকেলের সাইজ। নিটোল ন্যাড়া এবং সেই ন্যাড়া মাথায় একটি রকমারি রঙের পুঁথির চন্দ্রহার জড়ানো। মূর্তিটির মাথা থেকে পা পর্যন্ত কোনো পোষাক নেই। গাত্রবর্ণ চকচকে নীল। যথেষ্ট আলো থাকলেও বুঝলাম না মূর্তিটি নারী না পুরুষ। পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ উদাসীন এবং তার চোখের দৃষ্টি শিশুর মতো সরল। খালি গায়ে এই ঠাণ্ডায় তার কষ্ট হচ্ছে কী না, তার মুখ দেখে কিছুই বোঝার উপায় নেই। মাঝে মধ্যেই তার চারপাশে কৌতূহলী মানুষ দানা বাঁধছে দেখার জন্য কিন্তু সে নির্লিপ্ত। হেঁটে চলেছে সামনের দিকে।

কেউ হাসছে, কেউ অবাক চোখে তাকাচ্ছে, কেউ কেউ তার দিকে তাকিয়ে হাত তুলে নমস্কারও করছে। অথচ কোনো কিছুই তাকে স্পর্শ করছে না, যন্ত্রচালিত পুতুলের মতো সে হেঁটে চলেছে। ছোট দলটি অবশ্য কিছু রোজগার করছে মানুষটিকে সামনে রেখে।

হাঁটতে হাঁটতে পেঁছেছি মেলার পূর্ব দক্ষিণ সীমানার দিকে। রাত্রি বেড়েছে। বেড়েছে শীতের কামড়ও। তীর্থযাত্রীদের ছোটাছুটি হুড়োহুড়ি অপেক্ষাকৃত কম। হট্টগোলও কমেছে কিছুটা। অনেকেরই পথ আপাতত একমুখী। মেলায় ঘুরে বেড়িয়ে দেখার চেয়ে আপাতত হোগলার ছাউনির আশ্রয়টুকুই যেন এখন বেশি আকাঙ্খিত।

এদিকের রাস্তায় বালি ছাড়াও পায়ের নীচে শক্ত মাটির অস্তিত্ব অনুভব করতে পারছি। হয়তো ফিরে আসতাম। কিন্তু চোখে পড়লো সামনেই সারবন্দী চালা ঘরের মতন চৌখুপ্পি। পায়ে পায়ে এগোলাম। একটু এগিয়েই বুঝলাম অনেক শোনা সেই নাগা সাধুদের আখড়ার কাছেই এসেছি!

আলোর প্রাচুর্য নেই এদিকে। খোপগুলোকে ঘর কিংবা ঝোপড়ি যা-ই বলি, আসলে এক একটি আলো আঁধারি গহ্বর। ঝুলনযাত্রার মণ্ডপ সাজানোর মতো প্রতিটি প্রকোষ্ঠেরই পিছন দিকে কিছু বড়ো গাছের ডালপালা পাতা সমেত কেটে এনে রাখা হয়েছে। সামনে বালির বেদী। তার ওপর সিঁদুর মাখানো নর করোটি দু একটা হাড়গোড় লোহার ত্রিশূল রুদ্রাক্ষের মালা খুচরো পয়সা গাঁজার কল্‌কে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে রয়েছে। কোনো কোনো খোপের মধ্যে মোমবাতি কিংবা মাটির প্রদীপ জ্বলছে। কোনোটি পুরো অন্ধকার। নারকেল ছোবড়া আর ধুনোর ধোঁয়ায় আলো আঁধার মিশিয়ে আধা ভৌতিক গুমোট পরিবেশ। বালির ওপরে উপবিষ্ট মাথায় চুড়ো বাঁধা জটাজুটধারী নগ্ন সাধু। নিরাভরণ গায়ে ছাই মাখা, কারও গায়ে তিল্‌ক কাটা, উল্কি আঁকা। সম্ভবত সপ্তমী সেবনে অনেকেরই চোখ টকটকে লাল এবং ফোলা ফোলা। বিভিন্ন ভঙ্গিমায় বসে আছেন

বিভিন্ন জন। কেউ পদ্মাসনে কিংবা নামাজ পড়ার ভঙ্গিতে হাঁটুমুড়ে। কেউ বসেছেন তাড়াতাড়ি পায়ের ওপর পা তুলে। কেউ উদাস চোখ মেলে নীরবে বসে আছেন; বিড় বিড় করে কিছু বলছেন কিংবা গুনগুন করে গান করছেন কেউ কেউ। আবার দু'একজনকে রীতিমতো কথাবার্তা বলতেও শুনলাম। উৎসাহী তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে তাঁরা ছোটখাট কোনো আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন। আলোচনার বিষয়বস্তুও মনে হচ্ছিল তাঁদের নগ্নতা। অনিবার্যভাবেই আমার নগ্ন সাধুদের পুরুষাঙ্গের দিকেও চোখ পড়ছিল। দেখি, অনেক সাধুবাবারাই সেখানে একটি করে ষ্টিলের কিংবা রুপোর রিং, আঙুলে আংটি পরার মতো পরে রয়েছেন। কেন, কিজন্য ঠিক বুঝলাম না।

কতো ঘর রয়েছেন জানি না। একের পর এক দেখতে দেখতে হেঁটে চলেছিলাম। নাগাসাধুর নাম ইতিপূর্বে অনেক শুনেছি, সুতরাং তাঁদের সামনা-সামনি দেখে ভাবনাচিন্তা খানিকটা আপনা আপনিই মাথায় খেলতে শুরু করে। আমার এই অপেক্ষাকৃত নির্জন প্রান্তরে দিকে চলতে চলতে কখন এক সময় থেকে একটু ফাঁকা লাগছিল। সামাজিক নিয়মকানুনে বন্ধনে বাঁধা আমাদের আটপৌরে জামা-কাপড় পরা সাংসারিক জীবন আর সর্বঅঙ্গ আবরণ পরিত্যক্ত এই উদাস নির্লিপ্ত নগ্ন জীবন যাপন মনে হলো যেন এই মুহূর্তে খুব কাছাকাছি। সামান্য ব্যবধান অথচ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে দুই সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী জীবন প্রবাহ।

আমার ভাবনাচিন্তা রুচি শিক্ষাবোধ এবং জীবন ধারণের রীতিনীতি এখনও পর্যন্ত সুস্থ শরীরে নিজেকে ওই অবস্থায় কল্পনা করতে পারে না। ঠিক সেইরকমই, অনুমান করি, ওই নগ্নগাত্র সাধুবাবারাও হয়তো আমাদের মতন গার্হস্থ্য জীবনে আর ফিরে আসতে পারবেন না, কিংবা চাইবেন না। অথচ প্রাকৃতিক নিয়মের একই পদ্ধতি প্রক্রিয়া এবং একজাতীয় কোষকলার বিভাজন বিবর্তন

এবং অবস্থানে গঠিত আমাদের এই দৈহিক কাঠামো। কবে থেকে তফাৎ জন্মে গেছে আমাদের দেখা আর দেখানোর মধ্যে, শরীরের আবরণ এবং উন্মোচন-এর মানসিকতা সম্পর্কে আমরা ভিন্ন মেরুর মতাবলম্বী। নানা মন্তব্য এবং আলোচনা সমালোচনা নানা সময়ে শুনেছি যার অনেকটাই অগভীর অপরিণত এবং সময় অতিবাহিত করার প্রয়াস। ভক্তি গদগদ শ্রদ্ধার বাণী, ব্যঙ্গ বিদ্রূপে বেঁকে ওঠা ঠোঁটের বক্রোক্তি অথবা নেহাত অনভ্যস্ত চোখ ধাঁধিয়ে ওঠার চমকানি কোনোটিকেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি। আমি নীরব থেকে গেছি এমন পরিস্থিতিতে নিজের অক্ষমতায়। কৃচ্ছ্রসাধনের পরি-প্রেক্ষিতে এই নগ্ন জীবন যাপনের পক্ষে অথবা বিপক্ষে আমার কোনো বক্তব্য গড়ে ওঠেনি। ভালমন্দ বলতে পারি না। সিদ্ধান্ত গ্রহণের আকাঙ্ক্ষায় নিঃসংকোচে বলতে পারি, মনুষ্য জন্মের এই চিরন্তন বোধ-এ আমি এঁদের কাছে পরাজিত। তার নাম লজ্জা। আমি কিছুতেই একটি আতিশয্য মেশানো তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে বলতে পারি না, এই নগ্নতা একটি বিকৃতি অথবা একইরকমভাবে নিজের মতামত হিসাবে সোচ্চার হয়ে বলতে পারি না এই নগ্নতা ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্বর্গ জয়ের মাপকাঠি। এখনও পর্যন্ত এই উলঙ্গ সাধুবাবাদের জীবনযাপন আমার কাছে একটি বিস্মিত বিহ্বল জিজ্ঞাসা। আমার মাথার মধ্যে সুদূরের ঝিম ধরানো প্রশ্নের আবর্ত কেবল পাক খেয়ে চলে এঁদের কথা ভাবলে। আমার যোগ্যতা এঁদের বিশ্বাস ও দর্শনকে ছুঁতে পারে না।

সাধুদের আখড়ার শেষ দিকে চলে এসেছিলাম। সম্ভবত একেবারে শেষ ঘরটির মধ্যেই একটু অন্য ধরনের ব্যবস্থা দেখে দাঁড়ালাম। অপেক্ষাকৃত বড় ঘরটি। পিছনদিকে ত্রিপল, গাছের কাটা ডাল ইত্যাদি থাকলেও সামনে বেশ খানিকটা জায়গার ওপর চট ইত্যাদি পাতা রয়েছে এবং সেখানে বেশ কয়েকজন বসে রয়েছেন। জনা দু-তিন আড়াআড়ি পা তোলা বেশ আধুনিক আধুনিক দেখতে সাধুও

রয়েছেন। তাঁরা যদিও নগ্ন তবু কিছু আভরণের নতুনত্ব রয়েছে তাঁদের অঙ্গে। হাতে তাঁদের মোটা স্টিলের ব্যান্ড লাগানো ঘড়ি, চোখে চশমা এবং গলায় রুদ্রাক্ষের সঙ্গেই সোনার চেন-ও রয়েছে বলে মনে হলো। সামনে যাঁরা বসে রয়েছেন তাদের মধ্যে কয়েকজন মহিলা দেখলাম এই প্রথম এবং সম্ভবত তাঁরা তথাকথিত হিপিনী এবং শেতাঙ্গিনী। এঁদের কারো হাতে দোতারা খঞ্জনী ইত্যাদি রয়েছে। বেশ গাদাগাদি করে সকলে বসেছেন। দিব্যি জমাটি মজলিশ। মুখ বাড়িয়ে কাছে এসে আর একটু ভালো করে দেখতে যাবো ঠিক তখনই একটি বলিষ্ঠ সাদা হাত আমার হাত ধরে টানলো ভিতরের দিকে। সঙ্গে একটু জড়ানো ইয়াংকি গোছের কণ্ঠস্বর —হাই-ই, স্মার্ট গাই···। আমার মধ্যে "স্মার্ট গাই"-এর কী দেখেছিল তা সেই জানে। তবে তার হাতের লক্ষ্য যে আমিই তা বুঝতে পারছিলাম। কেননা, তার গরম হাত আমাকে রীতিমত টানছিল। কৌতূহল যে খানিকটা আমারও ছিল না, তা নয়। টানে খানিকটা এগিয়ে যেতেই হলো এবং একটু আধবসাও হতে হলো। মুখে শুধু বললাম—হ্যালো!

দেখি লোকজন নেহাত কম নয়। জনা দশ বারো মহিলা পুরুষ বেশ হাত পা ছড়িয়েই বসেছে। অতোটা আগে দেখতে পাচ্ছিলাম না। শ্বেতাঙ্গ শ্বেতাঙ্গিনীদের সঙ্গে আরও যাঁরা রয়েছেন তাঁদেরও ঠিক তীর্থযাত্রী বলে মনে হয় না। হয়তো অন্য কোনো রসের রসিক; হ'তে পারেন সাধুবাবাদের শিষ্য শিষ্যা। ঝাপসা অন্ধকার এবং ধোঁয়ার কুয়াসা ভেদ করে এবার স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি দু জন নগ্ন সাধু একটু উঁচুতে বেদীর মতন কোনো কিছুর ওপর বসে আছেন। মাথায় জটা নেই, কিন্তু রেশমের মতো লম্বা চুল, কপালে গভীর সিঁদুরের রেখা, মুখে গোঁফদাড়ির জঙ্গল এবং সারা গায়ে ছাই (নাকি, পাউডার?) মাখা। একটি সুগন্ধের সঙ্গে গাঁজার ধোঁয়া মিশে অদ্ভুত এক ধরনের গন্ধ বেরুচ্ছিল। কোনো ব্যাপার নিয়ে

একটি আলোচনা চলছিল। বাতচিত সবই প্রায় ইংরেজীতে।
কিন্তু কথাবার্তা আলোচনা যাই চলুক মুহূর্তে আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জানিয়ে দিলো এই আখড়ায় একটি অবাধ এবং বিকৃত যৌনলীলা চলছে। ওপর ওপর প্রথমে দেখলে মনে হবে বুঝি এরা নেশায় বুঁদ হয়ে ঢলাঢলি করছে, মাঝে মাঝে হেসে উঠছে এবং কথাবার্তা বলছে। এদের এখানকার আলোচনার বিষয়বস্তুও বুঝতে পারলাম সেক্স্ পারভারসান ইত্যাদি।
আমার আদৌ ইচ্ছে নেই গঙ্গাসাগর মেলায় এসে কোনো যৌন সম্পর্কিত সেমিনারে যোগ দেবো। তাছাড়া ইচ্ছে অনিচ্ছের মধ্যেই হঠাৎ হাতের টানে এখানে ঢুকে পড়ার পর থেকে বুঝতে পারছি প্রায় জীবন্ত ব্লু-ফিল্ম-এর প্রদর্শনী চলছে এখানে। মাথায় খেলছে, এখানে এমনই একটি দল যারা অন্যান্য সাধুদের থেকে নিশ্চিত ভিন্ন গোষ্ঠির এবং যারা নিজেদের সাজ সরঞ্জাম এবং অনুষ্ঠানের পরিকল্পিত প্রস্তুতি নিয়েই এখানে এসেছে, তাদের আসল উদ্দেশ্যটা কী!
—খামন, ট্রাই ইট।
—সেই ছেলেটা, যে আমার হাত ধরে টেনেছিল, একটা সিল্ক্-এর রুমাল জড়ানো কল্কে এগিয়ে দিলো। কিন্তু আপাতত ও জিনিসে আমি কোনো আকর্ষণ বোধ করছি না, সবিনয়ে এটুকুর সঙ্গে একটি ছোট্ট ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলাম। আমার হাত আবার টেনে ধরার এক নেশাচ্ছন্ন প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল কিন্তু জিমনাষ্টিকের কায়দায় ততক্ষণে আমিও বাইরে। বেরিয়ে মাথায় হাত দিয়ে চোখের সামনে হাত এনে দেখি, এইটুকু সময়ের মধ্যে ওরা আমায় কখন লাল এবং সবুজ আবীর মাখিয়ে দিয়েছে।
তা দিক। রকম ফেরে নরকযন্ত্রণা ভোগ করার চেয়ে এই অত্যাচারটুকু মেনে নেওয়াই ভালো। দূরে চলে আসতে আসতে ওদের আখড়ায় জোর হৈ হল্লা হচ্ছে শুনলাম। সঙ্গে পাঁচমেশালি গান।

মেলার পরিবেশ অনেকটা শান্ত ঝিমানো। বালি ঠাণ্ডা হয়েছে। খালি পায়ে একটু ভিজে ভিজে লাগছিল। লোকজনের দৌড় ঝাঁপ ব্যস্ততা প্রায় নেই। অল্প স্বল্প কয়েকজন মুড়ি ঝুড়ি দিয়ে ক্লান্তির টানা পায়ে যাতায়াত করছেন। উঁচুতে মার্কারি আলোগুলো ঘিরে এব মধ্যেই ঝাপসা ধোঁয়ার বৃত্ত। কাঠকুটো হোগলা ইত্যাদি ধরিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে আগুন জ্বলছে এখানে ওখানে। লক্ লক্ করে উঠছে তার শিখা। ছাউনির আশ্রয় জোটাতে পারেননি এমন হাজার হাজার পুণ্যার্থী, যে যেখানে পেরেছেন বালির ওপরেই যাহোক কিছু পেতে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে পড়েছেন। লাল আগুনের শিখায় মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছি কোনো কোয়াটার্স-এর ধার ঘেঁষে সার দিয়ে শুয়ে পড়েছেন তীর্থযাত্রীরা। গভীর নিদ্রায় এর মধ্যেই অচেতন। হঠাৎ হঠাৎ কোনো ঘুম ভাঙা বাচ্চার কান্নার আওয়াজ কানে আসছিল। কখনও সরু গলা কুকুরের ঘেউ-উ। বাতাসে এবার শীতের কনকনে চাবুক যেন জামাকাপড় ভেদ করেও গায়ে আছড়াচ্ছে। উত্তরের দমকা বাতাসের সঙ্গেই কানে আসছিল ঢেউ ভাঙার শব্দ। বুঝতে পারছি কোনো একটা দিকের পাড়ের কাছাকাছি চলে এসেছি।

তথ্যকেন্দ্রের যে মাইক সারাক্ষণ গাঁক গাঁক চিৎকার করে সারাদিন বিরক্তি উৎপাদন করেছে, এখন সেখানেই হঠাৎ শুনতে পেলাম একটি আজন্ম পরিচিত কীর্তনের দু লাইন। কোনো সুমিষ্ট একক মহিলা কণ্ঠ গাইছেন—"সখী, লোকে বলে কালো, কালো নয়—সে যে আমারই চোখের আলো।" একই সঙ্গে ভালো লাগা এবং মন খারাপ মিশে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো। যাঁর কণ্ঠে এ গান আমি জন্মে পর্যন্ত শুনে এসেছি, মাত্র কিছুদিন আগে তিনি ইহলোক ত্যাগ করে চলে গেছেন। ওই কীর্তনের লাইন আমার বুকে অন্য এক ধরনের মোচড় দেয়…।

ঘরে ফিরেই আসছিল। ঢেউ-এর শব্দে কেমন এক আকর্ষণ অনুভব করলাম। ইচ্ছে হলো একটু ঘুরে যাই। সকালে স্নানের ভিড়ে হয়তো

এর ধারে কাছে ঘেঁষতে পারবো না। রাত্রে একবার সাগরসঙ্গম দর্শনও হয়ে যাবে। পায়ে পায়ে ভিজে নরম নির্জন বেলাভূমির ওপর দিয়ে এগিয়ে গেলাম। দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশির দিকে মুখ করে দাঁড়ালাম। কালো রাত্রি কালো জল দূরে কোথাও মিশে গেছে তারা-ফোটা আকাশের সঙ্গে। চাঁদ ওঠে নি। রাত্রির অন্ধকারে মাঝে মাঝে জলে কোথাও চিকচিকিয়ে উঠছে সাদা ফেনায় ফসফোরাস। সমুদ্র বক্ষ থেকে উঠে আসছে হু হু বাতাস, কানের পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে মাথার চুল এলেমেলো করে। সমুদ্রে জোয়ার এসেছে। ফুলে ফেঁপে ওঠা জলে হাজার সাপের ফণা তোলা তরঙ্গবিক্ষোভ ফেটে পড়ছে। জল ছুটে আসছে, ফিরে যাচ্ছে। আমার ভেজা পায়ের নীচে সুড়-সুড়ি দিয়ে সরে যাচ্ছে বালি।

মনের মধ্যে অদৃশ্য অলৌকিক এধরনের প্রতিক্রিয়া ক্রমশ প্রভাব বিস্তার করছিল। কিভাবে যে বলতে হবে জানি না। আনন্দ বিষাদ সব মিলেমিশে যেন এক প্রগাঢ় শূন্যতা আমার। স্তব্ধ মহাকাল নেমে এসেছে দু চোখের সামনে অস্পষ্ট, অন্ধকার তবু অজানা কোনো এক জ্যোতি অলক্ষ্যে উদ্ভাসিত আমার মধ্যে। এই হা হা শ্বাস নিদারণ গম্ভীর বিশালতার কাছে আন্তরিক আত্মসমর্পণের কোনো বাধা থাকে না। প্রকৃতির এই আঁধার ঘেরা অদৃশ্য আয়নায় যেন দেখতে পাই আপনার প্রতিবিম্ব। আমি কে, আমি কেন! এক-দিন মাতৃজঠর থেকে নাড়ী ছিঁড়ে মুক্ত হয়ে দেখেছিলাম পৃথিবীর আলো, পিতৃবক্ষে পেয়েছিলাম উষ্ণ আশ্রয়; তারপর আনন্দ দুঃখ যন্ত্রণা লোভ ক্ষোভ ভালবাসা বঞ্চনা সব মিশিয়ে ক্রমশ পার হয়েছি শৈশব কিশোর, প্রবেশ করেছি চির উচ্ছ্বসিত যৌবনে। পালন করে চলেছি তার গতানুগতিক কর্তব্য, ধারা ধর্ম।

তারপর! এই অব্যাহত গতি বিস্তৃত জীবনের কোথায় আমার ঠাঁই? আমি কী চাই, কী পেয়েছি, কী পাবো…কেনই বা অকস্মাৎ এসব উদ্বেল হয়ে উঠে মনে আসা… !

নিঃশব্দে কুল কুল করে ছাপিয়ে ভেসে গেল দু চোখ। জানি না কেন, কোনো গোপন অনুভূতির মিশ্রণ প্রবল আবেগে উচ্ছাসিত অশ্রু-ধারায় মহাপ্লাবনের মতো চোখে নেমে এলো। সেই মুহূর্তে আমার তো কোনো দুঃখ ছিল না। সামনে অন্ধকার উচ্ছল সমুদ্র, পিছনে ঘুমন্ত লক্ষ মানুষের মেলা। একাকী তার মাঝে দাঁড়িয়ে আছি নির্জন সৈকতে। যেন সময়ও এসে থমকে দাঁড়িয়েছে আমার সঙ্গে। আমি যেন প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকেই এই পৃথিবীর প্রতিভূ হিসাবে দাঁড়িয়ে আছি এই অনন্ত জলরাশির সামনে। চাওয়া নেই, পাওয়া নেই, শুধু নিরাকার অপার্থিব এই অফুরন্ত সৌন্দর্যের সামনে আমি স্থির অচঞ্চল থাকতে পারি আরও বহু যুগ বহুকাল।

—সো-ও, দেয়ার য়্যু আর—।

পরিচিত কণ্ঠস্বর আর ঢেউ ভাঙা জলের ওপর ছপ ছপ পায়ের শব্দ ভেসে এলো পিছন থেকে। বেশ কিছুক্ষণ পরে যেন একটি নিশি পাওয়া ঘোর থেকে আচমকা জেগে উঠলাম। দু হাত মুখে চোখে বুলিয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম। সেই পাদ্রীসাহেব, মিষ্টার ম্যাথুজ দু হাত বাড়িয়ে আহ্বান জানাচ্ছেন।

একই সঙ্গে অবাক এবং লজ্জিত হলাম ভদ্রলোককে দেখে। এগিয়ে আসতে আসতেই দেখি, তাঁর মাথার চুল বাতাসে অবিন্যস্ত। সাদা লম্বা আলখাল্লা কোটের নিচের অংশ ভেজা এবং নোংরা হয়েছে জলে। পায়ের বুট-ও ভিজে ঢোল। তাঁর বাড়ানো দুই হাতে স্পর্শ করলেন আমার হাত।

—দেখেছেন তো, ঠিক জায়গাতেই আপনার সন্ধান করেছি।—ফাদার বললেন।

খুব অস্বস্তি আর সংকোচ হচ্ছিল। আমার ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে রাত বেড়েছে। এদিকে একই কোয়ার্টার্স-এ থাকার বন্দোবস্ত বলে, দরজা আটকে নিজেরা শুয়ে পড়তে পারছেন না। আসানসোল থেকে

এসেছেন ওঁরা, যথেষ্ট ক্লান্ত হওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত আবার খুঁজতে বেরিয়েছেন।

পাড় থেকে উঠে আসতে আসতেই বললাম—আপনাদের খুব ঝঞ্ঝাটে ফেলেছি। কাউকে খুঁজতে বেরিয়েছেন নিশ্চয়ই। ছি ছি, আমার খুব খারাপ লাগছে।

—য়ু্য আর পার্টলি কারেক্ট। উঠে এসে সাহেব বললেন—আপনাকে খুঁজতে বেরিয়েছি সেটা ঠিক কিন্তু আপনার জন্য উই আর ইন ট্রাবল সেটা ঠিক না।—আরও কয়েক পা হেঁটে এগিয়ে এসে মিষ্টার ম্যাথুজ আবার বললেন—আসলে বেলা এ্যাণ্ড ঘটক দুজনেই আপনার দেরি দেখে ওয়ারিড। রাত্রি অনেক হয়েছে তো।

ফাদার কথাটা এমনভাবে বললেন এবং শুনে আমার এমন অবাক লাগলো যে ওঁর মুখের দিকে সোজাসুজি তাকালাম। বেলা নামের সেই ফর্সা মহিলা এবং মিষ্টার ঘটক দুজনের সঙ্গেই আমার নামমাত্র কথাবার্তা হয়েছে ইতিপূর্বে। হৃদ্যতা দূরের কথা, আলাপ পরিচয়ও তেমন কিছু হয় নি। কিন্তু এটুকু সময়ের মধ্যে ওঁরা যে আমার প্রতি একটি আন্তরিক আকর্ষণ অনুভব করেছেন, এই কঠিন পৃথিবীতে এসব আমাদের কাছে অবাক হওয়ার মতোই ঘটনা। অথচ এ ঘটনা সত্য। আমি যেন তাঁদেরই বাড়ির কেউ। অজানা অচেনা নতুন জায়গা, রাত হয়ে গেছে, ফিরতে দেরি দেখে তাই খোঁজ করতে পাঠিয়েছেন। ফাদারকে আর কিছু জিগ্যেস করতে পারলাম না। সংকোচ এবার নিজের থেকেই আমায় চুপ করিয়ে রাখলো। মনে পড়ছে নিজের বাড়ির চেহারা। যদিও আপাতত এ জায়গায় গৃহস্থ বাঙালীর সংসার নয়। কোনো কারণে রাতে ফিরতে দেরি বলে, ঘরে উৎকণ্ঠিতা মা দিদি কিংবা সদা হুতাশে ত্রস্ত দাদাকে বেরুতে হবে খুঁজতে এমন নয়। সাগর দ্বীপের মেলা, লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী জড়ো হয়েছেন মাত্র দু তিন দিনের জন্য বালুচরে। যে যার জায়গায় ফিরে যাবেন শেষ হওয়া মাত্র। অথচ একটু বিচার বিশ্লেষণ করলেই

মনে হচ্ছে মনের ব্যাপারটা তো সেই একই রকম। রাত বিরেতে চেনা মানুষটা গেল কোথায় তার একটা খোঁজ খবর করা হবে না! ঠিকই তো। পরিস্থিতি আমাদের কঠোর স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক করে দেয়। কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের তো এই-ই সম্পর্ক। দুশ্চিন্তা ভালবাসা হীনতা রাগ দুঃখ কান্না এই সব দিয়েই তো গড়া একটা পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের চেহারা। আমরা অনেক ক্ষেত্রেই টুকরো টুকরো এক একটা অংশ দেখি, আর তার ওপরেই নির্ভর করে একটা ধারণা খাড়া করে নিই এক একজনের সম্বন্ধে। তখন মনে রাখি না আংশিক দেখার অর্থ প্রকৃত মূল্যায়ন নয়, চেনা জানাও নয়, একটা সামান্য ধারণামাত্রই—যা কখনই সম্পূর্ণ ও সামগ্রিক নয়।

পাঁচ কথা চুপচাপ ভাবতে ভাবতে আমাদের সরকারী আবাসের কাছাকাছি এসে পড়েছি। গায়ে মাথায় কম্বল জড়ানো ভূতুড়ে চেহারাটা যে মিষ্টার ঘটকের তা বোঝে কার সাধ্যি! বুঝলাম, যখন খবু সামনে এসে ভদ্রলোক মাথা থেকে কম্বল সরিয়ে হঠাৎই রীতি-মতো ঝেঁজে উঠলেন

—বেড়ে লোক তো মশাই আপনি! সেই যে একটু ঘুরে আসছি বলে চলে গেলেন, তারপর আর টিকিটির দেখা নেই এতো রাত পর্যন্ত, অ্যাঁ!

ভদ্রলোক সম্বন্ধে কি ভাগ্যিস খানিকটা আগেই জেনে নিয়েছিলাম, নয়তো এতোক্ষণ পরে দেখা হওয়ামাত্র পুরো শাসনের ভঙ্গিতে যে-ভাবে বচন শুরু করলেন, তাতে মেজাজ আমার অন্যরকম থাকলে, বলা যায় না, ভুল বুঝে ফেলাটাই বিচিত্র নয়। কিন্তু এ ধরনের মানুষের পক্ষে এরকম হমকে সোচ্চার হওয়াটাই যে আন্তরিকতা সেটুকু বুঝেই চুপ করে রইলাম। কী আর বলবো! অপরাধ তো আমারই।

মিষ্টার ঘটক তখনও থামেন নি। বলে চলেছেন—আপনি বেড়াচ্ছেন ঘুরে, আর আমাদের এদিকে শালা···

বলেই ভদ্রলোক প্রায় এক হাত জিভ্ বের করে সঙ্গে সঙ্গে "সরি, সরি" বলে ফেললেন। তারপর আবার যোগ করলেন—যাক গে। খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে।

দেখতে পাচ্ছি, মিস্টার ম্যাথুজ আস্তে আস্তে মাথা দোলাচ্ছেন এবং ভাব দেখে মনে হচ্ছে মিস্টার ঘটকের কথায় উনি বেশ সংকুচিত বোধ করছেন। যদিও আমার অবস্থাটা পুরো অন্যরকম, কেননা, ঘটকবাবুর কথায় এই মুহূর্তে কিছু মনে করার চেয়ে, ভদ্রলোকের স্বতঃস্ফূর্ত সারল্য এবং স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশে এক ধরনের কৌতুকই অনুভব করছি।

ফাদার তা সত্ত্বেও মাথা দোলাতে দোলাতেই বললেন—নো, নো, মিস্টার ঘটক। আপনি যেভাবে ওনার সঙ্গে কথা বলছেন…

ঘটকবাবুর আগেই আমি বললাম—ওটা কিছু না। আমি কিন্তু কিছু মনে করিনি। সত্যিই তো ওঁরা এতোক্ষণ অপেক্ষা করেছেন—

ঘটকবাবু এবার ফাদারকে বললেন—আমি কী করবো ফাদার, বলুন দেখি। এ ভদ্রলোক কেটে পড়েছেন সেই বিকেলে, আপনিও খুঁজতে বেরিয়েছেন ঘণ্টখানেকের ওপর। আমি শুধু ঘর আর বার করছি। আর মা জননী হাতে খাবার নিয়ে বসে আছেন সেই কখন থেকে। এর পর মেজাজ আর কোন্…ন্-না, কার মেজাজ ঠিক থাকে! এসব গোলমেলে জায়গা, কোন খপ্পরে পড়লো…

আস্তে বললাম—সত্যি আমার খুব অন্যায় হয়েছে।

কথা বলতে বলতে আমরা ঘরের কাছেই চলে এসেছি। মিস্টার ঘটকের উষ্মা এবং মেজাজ তখনও পুরো কমেনি। আমার কথা শুনেই বললেন—থাক্, ঢের হয়েছে। আপনার ন্যায় অন্যায় বুঝবেন ফাদার আর মা জননী। এখন দয়া করে ঘরে ঢুকুন; পেটে আমার ছুঁচোয় ডন মারছে।

সত্যি কথা বলতে কী, ভদ্রলোকোর লম্বাচওড়া চেহারা, গরম মেজাজ ইত্যাদির সঙ্গে সরল মানসিকতাটুকু উপলব্ধি করে আমার প্রায়

হাসিই পাচ্ছে। মিষ্টার ম্যাথুজ-ও মাথা নীচু করে মিটিমিটি হাসছিল।

ঘটকবাবু এগিয়ে গেলেন। পুরোপুরি একটি পারিবারিক চেহারা চরিত্র। হাঁটতে হাঁটতেই বুঝলাম আশপাশের প্রতিটি কোয়াটার্স ভর্তি হয়ে গেছে। গালগপ্পো গান আড্ডায় রীতিমত জমজমাট পরিবেশ। ঠাণ্ডার ভয়ে কেউ আর বাইরে বেরোয়নি বটে, কিন্তু নিজেদের ঘরটির মধ্যে বসে দিব্যি মৌতাত চলেছে। পাশাপাশি ঘরের মধ্যে শুধুমাত্র হোগলার বেড়া দেওয়া পাঁচিলের আড়াল। টুকরো কথাবার্তা হাসি শোনা যাচ্ছে। রান্নার ছ্যাঁক ছোঁক, হাতা খুন্তি নাড়ার সঙ্গেই চালেডালে একসঙ্গে বসিয়ে দেওয়া খিচুড়ির গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে। হারমোনিয়ম ডুগি তবলা বাজিয়ে প্রায় জলসা হচ্ছে কোন্ ঘরে। আমাদের নিজেদের ঘরে ঢুকতে গিয়েই শুনি, পাশের ঘরে কোনো বয়স্ক ভারি গলা গল্প বলছেন—…তারপর তো অংশুমান অযোধ্যায় ফিরলো, ঠাকুর্দা সগর রাজার কাছে গিয়ে বললো—দাদু, আপনার আশীর্বাদে এই সেই অশ্বমেধের ঘোড়া…

হোগলার দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলাম। পিছনে মিষ্টার ম্যাথুজ। ঘটকবাবু ইতিমধ্যেই ঘরে ঢুকেছেন। দেখতে পাচ্ছি, সেই নাকে চিকচিকে পাথর স্নিগ্ধ ফর্সা মহিলা কাগজের প্লেটে খাবার তুলছেন। আয়না না দেখেও বেশ বুঝতে পারছি লজ্জা আর সংকোচের রেখাগুলো নিশ্চয়ই মুখে ফুটে উঠেছে। কিন্তু কী করবো, পালাতে তো পারি না। ভদ্রমহিলা মুখ তুলে দেখতে পেয়েই বললেন—আসুন।

একটু থেমে আমাদের বসার জায়গার ব্যবস্থা করে দিতে দিতেই আবার বললেন—ইচ্ছে মতো ঘুরে বেড়ানয় বাধা পড়লো তো!

দুপুরবেলা যে খাটটিতে শুয়েছিলাম, এখন জিনিষপত্র ব্যাগ জামাকাপড়ের পাহাড় তার ওপর। তারই এক কোণায় ভদ্রমহিলা আমার বসার ব্যবস্থা করে দিলেন। ঠিক ভেবে পাচ্ছি না কী বলবো। মিষ্টার ঘটক এর মধ্যেই একবার তাড়া লাগালেন—দিয়ে দিন এবার

মা। ক্ষিদেয় আমার কাহিল অবস্থা।

আমি আস্তে আস্তে বললাম—আপনারা আমার জন্য এতোক্ষণ না খেয়ে বসে থাকবেন জানলে নিশ্চয়ই আরও আগে চলে আসতাম।

—তাহলে আপনার বেড়ানোটা ইনকমপ্লিট থেকে যেতো। —ফাদার বললেন। তিনি এর মধ্যে একটি স্যুটকেশ জাতীয় কিছু টেনে নিয়ে তার ওপর বসেছেন।

দেখি, স্তূপীকৃত জিনিষ ভর্তি খাটটির পাশে বিচুলির বিছানায় কম্বল পেতে দিব্যি আরামে সেই ছেলেটি আর মেয়েটি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ভদ্রমহিলা একটি বড় এ্যালুমিনিয়ম-এর টিফিন ক্যারিয়ার থেকে খাবার তুলে সাজাচ্ছেন প্লেটে। পাঁউরুটির পীস্-এর মতো কাটা কেক্, ঘুগনি জাতীয় কিছু একটা, কলা এবং সন্দেশ। ঘটক-বাবুর আর তর সইছিল না। প্লেট হাতে পাওয়ামাত্র চাকুম চুকুম শব্দটব্দ করে খেতে শুরু করে দিয়েছেন। গভীর পরিতৃপ্তির সঙ্গে হাতের আঙুল চুষছেন। সামনে খাবার দেখে এবং তার গন্ধে অনেক-ক্ষণ পরে আমিও বেশ বুঝতে পারছি একটি ক্ষুধার্ত পশু পেটের মধ্যে বসে রয়েছে। জল সরছে মুখের মধ্যে। ভদ্রমহিলা বললেন—আমাদের কোনো অসুবিধে হয়নি আপনার দেরির জন্য। বরং ঘটকবাবু-ই একটু রেস্টলেস…

—না না না, মা জননী, ঠিক তা নয়, আসলে—

ভদ্রলোক মুখের মধ্যে ভর্তি খাবার নিয়ে কথা বলছিলেন, বাকীটা একবারে শেষ করতে পারলেন না। কিন্তু বোঝা গেল খাবার টাবার পেয়ে আপাতত তাঁর মাথা একটু ঠাণ্ডা হয়েছে। খাবারটুকু গলাধঃ-করণ করে আবার বললেন—আসলে আমার ভাবনা হচ্ছিল, হয়তো উনি আর রাতে না ফিরে অন্য কোথাও থেকে যাবেন।

—কেন? মিষ্টার ঘটকের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলাম।

—মানে, আপনি একা মানুষ। শুধু শুধু আর আমাদের ঝামেলার মধ্যে জড়াবেন কেন, এই আর কি। —ঘটকবাবু বললেন।

আমি ও'দের সকলের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বললাম—অথচ দেখুন, এখন আমিও আপনাদের ঝামেলা হয়ে দাঁড়িয়েছি। রাত জেগে অপেক্ষা করতে হচ্ছে।

—না, না ছি, ও কথা বলবেন না। —ফাদার বললেন।

—তাই কেউ ভাবে! ভদ্রমহিলা বললেন। —একা মানুষ আপনি এসেছেন। অসুবিধে কিছু হলে আপনারই হওয়ার কথা। ঘরটাও তো আমরা দখল করে নিয়েছি।

—আপনারা না থাকলে, এখন মনে হচ্ছে, একা একা এ ঘরে আমি থাকতে পারতাম না। —আমি বললাম।

মিস্টার ঘটক একটি দীর্ঘ পরিতৃপ্তির ঢেকুর তুললেন।

আমার মাথায় ভাবনা যথারীতি একটি অন্য খাতে একইসঙ্গে প্রবাহিত হয়ে চলেছিল। মনে হচ্ছিল না এখন যেখানে বসে রয়েছি, সেটি গঙ্গাসাগর মেলায় চরের ওপর একটি অস্থায়ী কোয়ার্টার্স। যেন একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের সংসারের মধ্যে রয়েছি। যাঁদের সঙ্গে রয়েছি, তাঁরা আমার অনেক পরিচিত। ও'দের পারস্পরিক সম্পর্কও যেন আমার হিসাবে অনিবার্য। গিন্নী খেতে দিচ্ছেন, কর্তা বসে রয়েছেন, ছেলেমেয়েরা ঘুমুচ্ছে. একজন নিকট আত্মীয় সঙ্গে রয়েছেন, আর আমি কাছাকাছি এসে পড়া একজন অতিথি। কথাবার্তায় অন্যরকম শুনেছি বলেই, নয়তো আপাতত এই ঘরের ছবির সঙ্গে,ও'দের সম্পর্ক আমার ভাবনার মতোন হলেই যেন ব্যাপারটা সম্পূর্ণ হতো। অথচ আগেই জেনেছি এবং শুনেছি ও'দের সম্পর্ক আমি যে রকম ভেবেছি সেরকম নয়।

কী জানি! মনুষ্য চরিত্রের কতটুকু গভীরেই বা আমি প্রবেশ করতে পারি! শুধু নীরবে মনে মনে একটি প্রতিক্রিয়া হয়। চোখে দেখা এবং কানে শোনার বাইরে অনুভূতি আর একটি ধারায় বহে। সেই নীরব অনুভূতি ক্রমাগত আমার মধ্যে একটি অন্তস্রোত সৃষ্টি করে চলেছে। আমি যেন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, ওই সুশ্রী মধ্যবয়স্কা

ঢলঢল অথচ থমকানো চেহারার মহিলা এবং এই মিষ্টার ম্যাথুজ দুজনেই একটি অকথিত অলিখিত অথচ অটুট বন্ধনে বাঁধা পড়ে গেছেন। ওঁদের বলা কওয়া ইচ্ছে প্রয়োজন আড়ম্বর হয়তো কোনোটাই কোনোদিন সোজাসুজি সোচ্চার হয়ে ফুটে ওঠেনি কিংবা উঠতে পারেনি। কিন্তু জীবনযাপনের সাবলীল উচ্ছ্বাসেই কবে থেকে কাছাকাছি পাশাপাশি এসে পড়েছেন। প্রকৃতির স্বাভাবিক আকর্ষণেই যেন তৈরি হয়ে গেছে সম্পর্কের অদৃশ্য সাঁকো। অথচ বাস্তবে, জানি না, হয়তো তার রূপান্তরের কথা ভাবতে গিয়ে, ওঁদের নিজেদের ভিতর থেকেই জন্ম নিয়েছে সামাজিক রীতি-নীতির নিরুদ্ধার আশংকা, স্বেচ্ছায় বরণ করে নেওয়া জীবন থেকে চ্যুতির গ্লানি। তবু সরে যেতেও পারেননি। স্রোতে ভাষা দুটি ফুলের মতোন জলের একই টানে ভেসে চলেছেন পাশাপাশি।

কিন্তু ব্যাপারটা কী! ভদ্রমহিলা খাবারদাবার সব গোছগাছ করে সেই যে প্লেটে সাজিয়ে রেখেছেন, আর বিশেষ কিছু তো বলছেন না!

মিষ্টার ঘটক দু একটি হাই তুলে ফেলেছেন ইতিমধ্যে। ফাদারেরও চোখের পাতা ভারি। আর আমার পেটে আর মুখের অবস্থা তো আমিই বুঝছি।

মিষ্টার ম্যাথুজ নিজেই নীরবতা ভাঙলেন।

—আর কি, এবার খাওয়াদাওয়া মিটিয়ে নিলে তো হয়। কাল প্রাতঃকালেই উঠতে হবে।

এই প্রথম লক্ষ্য করলাম ভদ্রমহিলা যেন কিঞ্চিত দ্বিধাগ্রস্ত। ইতস্তত করে একটি প্লেট তুলে দিলেন মিষ্টার ম্যাথুজের হাতে। আর সেই সঙ্গেই দৃষ্টিতে নীরব কী যেন ভাষা নিয়ে তাকালেন ওঁর দিকে এবং মিষ্টার ঘটকের দিকেও। সমস্যাটা ধরতে পারছি না, যদিও আমার সামনেই ব্যাপারটা ঘটছে। বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গেছি।

হঠাৎ হো হো শব্দে হেসে উঠলেন মিষ্টার ঘটক।

—ওহ্, আচ্ছা বঝেছি, বুঝেছি।

হাসি থামিয়ে আমার দিকে তাকালেন ঘটকবাবু। বললেন—বুঝলেন তো, মা জননী আসলে একটু দ্বিধা করছেন।

আমি খুব অবাক হয়ে একবার মিষ্টার ঘটক আর একবার ভদ্রমহিলার মুখের দিকে তাকাচ্ছি। মিষ্টার ঘটক একটু থামলেন। তারপর আবার বললেন—

মানে আমরা সব খ্রীশ্চান কিনা! আপনাকে তাই খাবার দিতে—

আর শোনার প্রয়োজন ছিল না, সমস্যাটা বুঝে ফেলেছি। কিন্তু কী বলবো! সেই দুপুরবেলা ওঁদের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত, ওঁরা খ্রীশ্চান আর আমি হিন্দু এই বিশেষ ধর্মীয় প্রভেদ আমার মাথায় কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি। সত্যি বলতে কী আলাদা করে আমি যে ধর্মে হিন্দু, সে কথা আমার মাথায় একমাত্র উদয় হয় যখন কোনো ফর্ম ইত্যাদির কলামে লিখি, তখন। তাছাড়া নয়। আমি আমাদের ধর্ম পুস্তক গীতা উপনিষদ ইত্যাদি নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি বটে, কিন্তু তার উদ্দেশ্য ধর্মকর্ম করা নয়। নেহাৎ কৌতূহল ও জুগুপ্সা। মানুষের পরিচিতিকে স্পষ্ট করার জন্য ডাক টিকিটের ওপর শীলমোহর ছাপ-এর মতন এই ধর্মছাপ না থাকলে ক্ষতি কী! বিশ্বাস-অবিশ্বাস পছন্দ অপছন্দের বোধ ও স্বাধীনতা থাকলে নিজের জ্ঞানবুদ্ধি শিক্ষা চিন্তা দিয়েই তো আপন উদ্ভব অস্তিত্ব ইত্যাদি জেনে নেওয়া যায়।

কিন্তু এখন যে কিছু একটা বলতে হয়। ঘরের পরিবেশ যেন হঠাৎই আমার কিছু বলা ও সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। অথচ নতুন করে আমার সিদ্ধান্ত নেওয়ার কিছু নেই।

খাট থেকে নেমে হাত বাড়িয়ে একেবারে ভদ্রমহিলার দুখানা হাত ধরে ফেললাম। বললাম— একেবারে মিছিমিছি আপনার এই দ্বিধা। আমার মাথায় এ ভাবনা আদৌ আসেনি।

হাত ছেড়ে ওঁর সামনেই উল্টে হাত পেতে বললাম—দিন, তুলে দিন।

খুব ক্ষিদে পেয়ে গেছে।

হাতে করে খাবারের প্লেট নিয়ে আমার হাতে দিলেন। স্পষ্ট দেখতে পেলাম খুশি আর আবেগে একটি নিশ্চিন্ত শ্বাস ফেলতে পারার সঙ্গেই ভদ্রমহিলার দু চোখ টলমল করে উঠেছে।

মনে মনে ভাবছিলাম হয়তো একটু নাটকীয় হয়ে গেল ব্যাপারটা, তাহলেও ক্ষেত্র বিশেষে একটু আধটু উচ্ছ্বাস ইত্যাদি মানুষকে সহজ হতে সাহায্য করে। আমাকে খাবার দেওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে ভদ্র-মহিলা যেন অনেকক্ষণ থেকেই টেনশান্-এ ছিলেন। এতোক্ষণে তার নিষ্পত্তি হওয়ায় ঘরে যেন সহজ বাতাস খেলে বেড়াতে লাগলো।

মিষ্টার ম্যাথুজ খেতে খেতে বললেন—নাউ য়্যু মাস্ট রিমেমবার বেলা, আমি তোমাকে কী বলেছিলাম ?

—আপনি বলেছিলেন বটে, কিন্তু ওঁর মুখ থেকে সেটা না শোনা পর্যন্ত আমি কী নিশ্চিন্ত হতে পারি! তাছাড়া আপনি নিজে মহৎ বলেই—

—না, না, সেটা কিছু না।—ফাদার বললেন—আসলে আমি তো কিছুক্ষণ ওঁর সঙ্গে মিশেছি, তাতেই—

ওঁরা কথাবার্তা বলছেন। আমি কিন্তু পরিবেশটি বেশ উপভোগ করছি নিজের বিচার ক্ষমতা দিয়ে। আর যতোই দেখছি, মনে হচ্ছে, একটু বাড়াবাড়ি হলেও আমার ধারণাটাই যেন সত্য। একটি পুরো-পুরি সংসারের মধ্যে বসে আছি।

ঘুমে জড়ানো হাই তোলা মিষ্টার ঘটকের গলা শুনলাম।

—আমার খুব ঘুম পেয়ে গেছে। আপনারা আসুন, আমি বরং শুই।

আমারও খাওয়া হয়ে এসেছিল। বলার কথাটা সেরে নিলাম।

—আমি কিন্তু ভোররাত্রে একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবো। আপনারা চিন্তা করবেন না।

—না না নিশ্চয়ই।—মহিলা বললেন। সকালবেলাই তো দেখার।

ব্রাহ্মমুহূর্তে স্নান।

চৌকির ওপরেই ব্যাগ ছিল। হাতে নিয়ে ফাদারের সঙ্গে বেরিয়ে এলাম। পাশের ঘরটিতে আমাদের শোওয়ার ব্যবস্থা। মোটামুটি একই রকম ঘর। টেবিল চৌকি বিদ্যুৎ বাতি নেই। আমাদের প্রয়োজনও বিশেষ ছিল না। হোগলার ফাঁক দিয়ে যেটুকু আলো আসছে তাই যথেষ্ট।

জামাকাপড় খোলার দরকার ছিল না। ব্যাগ থেকে কম্বল বার করে একটি পেতে নিলাম বিচুলির ওপর। আর একটি গায়ে চাপাবো। জুতো ভর্তি বাকী ব্যাগটা টেনে নিলাম মাথার কাছে বালিশের বিকল্প হিসাবে।

মিষ্টার ঘটক ইতিমধ্যে তলিয়ে গেছেন। গম্ভীর নাসিকা গর্জনে তাঁর ঘুম গভীর বলেই মনে হলো। মিষ্টার ম্যাথুজ সম্ভবত শোওয়ার পূর্বে তাঁর রাত্রির প্রার্থনা সেরে নিচ্ছেন। সোজা দাঁড়িয়ে দু কাঁধে আর কপালে বুকে হাত ঠেকিয়ে ক্রুশ আঁকছেন।

তথ্যকেন্দ্রের মাইক থেমে গেছে। নিঝুম স্তব্ধতা নেমে এসেছে সারা-দিনের পর। খোল করতাল বাজিয়ে শীতে কাঁপা গলায় নামগান হচ্ছে দূরে কোথাও। কানে আসছে সেই ঘুমপাড়ানি সুর। পাশের ঘরগুলোও সব চুপচাপ। আমাদের ঘরের বাইরে পাশ দিয়ে রাস্তা। বহু তীর্থযাত্রী সেখানেই দেয়াল ঘেঁষে সারি দিরে শুয়ে পড়েছেন। তাঁদের কথাবার্তার ছেঁড়া টুকরো কানে আসছে। শুনতে পাচ্ছি দূর থেকে ভেসে আসা কুকুরের ডাক। একটি কোলাহল মুখর দিনের প্রাণ চাঞ্চল্য যেন ক্লান্তিতে আর অবসাদে ঢলে পড়েছে। সারাদিন ধরে কানে আসা বিভিন্ন শব্দের অনুসরণ আর বিচিত্র সব দৃশ্যাবলী চকিতে চোখের সামনে ভেসে ওঠা সত্বেও, বুঝতে পারছি গভীর নিদ্রায় তলিয়ে যাচ্ছি।

কিসের আওয়াজে ঘুম ভাঙলো জানি না। হয়তো শরীর চাঙ্গা হয়ে

ওঠার মতো ঘুমটুকু হয়ে যেতেই অবচেতন মনের ব্যস্ততা সচেতন হয়ে উঠেছে। ঘোর লাগা ভাবটা কাটতেই টের পেলাম অন্ধকার কাটে নি কিন্তু পাশের রাস্তা দিয়ে লোক চলাচল শুরু হয়ে গেছে। চাপা গলায় কথাবার্তা এবং পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। মাইকে মন্থর-ভাবে স্তোত্র পাঠ আরম্ভ হয়ে গেছে।

কটা বাজে আন্দাজ পাওয়ার কোনো উপায় নেই, বাইরে না বেরুনো পর্যন্ত। উঠে বসতেই দেখি মিষ্টার ঘটক পা থেকে মাথা পর্যন্ত মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছেন একটি অদ্ভুত অন্ধকার পুঁটলির মতো। সামান্য তফাতে সাহেবও গভীর নিদ্রায় অচেতন। গায়ে দেন নি কিছুই। চিত হয়ে টানটান শুয়ে আছেন। বুকের মাঝখানে ক্রুশের ওপর ভাঁজ করা তাঁর দু হাত শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে ওঠানামা করছে।

আস্তে আস্তে উঠে পড়লাম। শরীর বেশ ঝরঝরে কিন্তু কম্বল থেকে বেরিয়ে আসতেই ঠাণ্ডায় হাত পা কেঁপে কেঁপে উঠছে। গায়ে সোয়েটার ইত্যাদি থাকা সত্বেও কম্বলটি আবার জড়িয়ে নিলাম। পাতা অপর কম্বলটি ভাঁজ করে ব্যাগে ভরে রাখলাম। আপাদমস্তক ঢেকে আর দেরি না করে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের হোগলার দরজাটি নারকেল দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল। আস্তে খুলে নিয়ে একেবারে রাস্তায়।

বালিতে পা দিয়েই মনে হলো ভিজে। পা একেবারে বসে যাচ্ছে। আর সেই সঙ্গেই ফাঁকা বাতাস যেন নাক মুখ যেটকু খোলা সেখানেই কুঁচো বরফ স্প্রে করে দিচ্ছে। দ্রুত চাদর এবং কম্বল শুধু মাত্র চোখ দুটো ছাড়া মাথার ওপর দিয়ে আরও ভালো করে জড়ালাম। নিজের চেহারা একটি কিম্ভুত আকৃতি নিয়েছে আন্দাজ করতে পারছি, কিন্তু আপাতত তা গৌণ; কম্বলটি ছিল তাই রক্ষে।

পায়ে পায়ে এগোলাম পাড়ের দিকে। স্নান দেখবো। মকর সংক্রান্তির পুণ্যস্নান। আজ প্রভাতে ব্রাহ্মমুহূর্তে সাগর সঙ্গমের পুণ্যসলিলে স্নাত হয়ে কয়েক লক্ষ পুণ্যার্থী তাঁদের ভবিষ্যত স্বর্গপ্রাপ্তির

সম্ভাবনায় নিশ্চিন্ত হবেন। অন্ধকার বেশ ঘন। মার্কারি লাইট যথা-রীতি জ্বলছে। মানুষজন বেরিয়ে পড়েছেন তার মধ্যে। জানি না, কোন্ অলক্ষ্য ঘড়ির এলার্ম শুনে এতো পুণ্যার্থী এই ভোররাতে আজ নিদ্রাভঙ্গ করেছেন।

বিভিন্ন এবং বিচিত্র বেশে পুণ্যার্থীরা চলেছেন। কারো চেহারা ভুতুড়ে, আমার মতন সর্বাঙ্গ ঢাকা। কেউ চলেছেন একেবারে খালি গায়ে শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে। কাঁপা গলায় ঠাকুরের নাম, ল্যাং প্যাং শরীরে পালোয়ানী কায়দায় হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে। আবার কেউ প্রায় দৌড়াচ্ছেন। যত্রতত্র আগুন জ্বলছে এখনও। তার কাছাকাছি কোঁকড়ানো কাহিল কিছু মুখ।

আমার পুণ্যসলিলে ডুব দেওয়ার বাসনা নেই। দেখার ইচ্ছে প্রবল। তাছাড়া এই কনকনে ঠাণ্ডায় সাগরের নোনা জলে অনভ্যস্ত স্নান করার খেসারৎ যদি বাড়ি ফিরে কয়েকদিন দিতে হয়, তাহলেই গেছি। দুদিন পরে ভুগবো কাসবো রুজি রোজগার বন্ধ হবে—ভয় সেখানে নয়। আশংকা আর একটা আছে। শুশ্রূষার সঙ্গে উপরি পাওনা হিসাবে গায়ে বিঁধানো বচন। এমনিতেই ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছি, তারপরে আবার বনের আপদও যদি ঘরে ঢোকে···। ঘরের লোকের ছেড়ে কথা বলার তো সত্যি কোনো কারণ নেই। বুঝতে পারি। বনের মোষ তাড়ানো এ ধরনের মানুষজনদের নিয়ে সংসারের যে কত রকম ভোগান্তি—বেশ বুঝতে পারি। শুধু বুঝে উঠলাম না, কী বস্তু দিয়ে ঈশ্বর গড়লেন যে দু নৌকায় পা দেওয়ার অবস্থাটা আর কাটাতে পারলাম না। মেঘে মেঘে বেলা হয়ে গেল, দায় দায়িত্ব যথাসময়ে প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই ঘাড়ে চেপেও গেল। ভেবে দেখার চেষ্টা করি নিজের ভিতরটা। না, এসকেপিস্ট্ বলতে যা বোঝায়, নিজেকে তা বলতে পারি না। তবে একথাও কবুল করতে লজ্জা নেই, কী একটা মাঝে মধ্যে ভিতরে ঘটে যায়। ঠিক যে হঠাৎ ঘটে যায়, বোধ করি তাও নয়। মাকড়সার জাল বুনে চলার

মতন এক নীরব মানসিক প্রস্তুতির জাল বোনা চলে। আপাতদৃষ্টিতে যেখানে আমার কোনো প্রয়োজন নেই, ভিড়ে যাওয়ার কোনো কারণ নেই, সেখানেই অদৃশ্য অন্তস্রোতের মতন কেমন যেন এক টান অনুভব করি। যুক্তি তর্ক ভাবনা তখন শিকেয়, চোখে ঘোর, আমোদে মজে যাই আপনা আপনি। নয়তো, গঙ্গাসাগর মেলাই হোক কিংবা পুরীর রথযাত্রা দেখতে যাওয়াই হোক তার মধ্যে আমার ভিড়ে যাওয়ার কোনো কারণ নেই। অকারণ এই অসম্ভব আনন্দানুভূতির উৎস এখনও পুরোপুরি সন্ধান করতে পারিনি।

ফিরে যাই আগের কথায়। বলছিলাম স্নান করার বাসনা নেই। আর একটা কথাও অবশ্য এর সঙ্গে বলা দরকার। ঠাণ্ডা লেগে যাওয়ার ভয় থেকে সে ভয়ও কম কিছু না।

শুনেছি, পুণ্যার্থীদের একাংশ নাকি জলে নেমেই প্রাকৃতিক কর্ম সারেন। তারই ফলশ্রুতি, অনেক তীর্থযাত্রী ভক্তিভরে সাগরের জলে ডুব দিয়ে উঠেই অকস্মাৎ মাথা থেকে দুর্গন্ধ আবিষ্কার করেন। মুহূর্তেই ওয়াক তুলতে তুলতে আবার ডুব দেন অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার জলে। বিপদ আছে এর পরেও। তীর্থক্ষেত্রে আবার সাবান ব্যবহারের নিষেধ আছে। সুতরাং ধোঁয়া দুর্গন্ধ তুলে ফেলার জন্য তখন মাথায় ঘষতে হবে চরের বালি। ভাবা যায় সেই অবস্থা! স্বর্গপ্রাপ্তি কামনা করতে গিয়ে নরকযন্ত্রণা!

লোকজন ক্রমশই বেরিয়ে পড়ছেন আলো আঁধারির মধ্যে। রাতের অন্ধকার কাটে নি, মেলার আলোও জ্বলছে, তবু পরিবেশ দেখেই মনে হচ্ছিল ভোর হতে বিশেষ দেরি নেই। অনেক জায়গাতেই আগুনের ওপর পড়েছে জলের ঝাপটা। আধপোড়া কালো কাঠ আর খড়ের নিভন্ত আঁচ থেকে ধোঁয়া উঠছে। বাতাসের সঙ্গে ধোঁয়া মিশে ছেয়ে ফেলছে দ্বীপের আকাশ। তারই মধ্যে হঠাৎ দমকা হাওয়ায় কোথাও লকলকিয়ে উঠছে দু একটি উঁচু লাল শিখা। খোল খঞ্জনীসহ কীর্তনের শব্দ উঠছে। থেকে থেকে কোনো জায়গা

থেকে মন্ত্রোচ্চারণ হচ্ছে।

কাঁথাকম্বল চাদর জড়ানো ভূত ভূত চেহারার অনেকেরই দেখছি লক্ষ্য চরের দক্ষিণ প্রান্ত। অন্ধকারে ভালো ঠাহর করতে পারি না, তবু নির্জনেরদিকে এই ভোরবাত্রে যাওয়ার উদ্দেশ্য খুব পরিষ্কার। কিন্তু পায়ে পায়ে খানিকটা এগুতেই বুঝলাম আমার ধারণা খুব ভুল। কোথায় নির্জনতা! সামান্য আড়াল আবডাল বলতে কিছু নেই। আমার আগে উঠে এতো হাজার হাজার মানুষ যে প্রাতঃকৃত্য সারতে চলে এসেছেন, আমার তো কোনো ধারণাই ছিল না। সরকারী উদ্যোগে গড়ে তোলা দরমা ঘেরা নিরাপদ নিশ্চিন্ত আড়ালের সংখ্যা নিশ্চয়ই কয়েক শ' এবং ওই দিকেই। কিন্তু সমগ্র তীর্থযাত্রীর সংখ্যার তুলনায় তা যে অতি অকিঞ্চিতকর, খানিকটা না দেখলে তা আমিও বিশ্বাস করতাম না। অবশ্য এই প্রভাতী বেগ ও তাড়নার সমসাময়িকতাও একটা ব্যাপার। তাছাড়া কেউ যদি এই সামান্য (!) ব্যাপারটুকুর জন্য নিজেকে কেন আর আড়ালে আবদ্ধ করবো ভেবে থাকেন, তাহলেও বলার কিছু নেই।

বেশি কাছে যাই নি। কিন্তু দূর থেকেই যা দেখলাম তাতেই আমার চক্ষু স্থির। লাজলজ্জা সব তুচ্ছ হয়ে গেছে। নারী পুরুষ শিশু, বৃদ্ধ বৃদ্ধা সবাই বসে পড়েছেন সার দিয়ে। কাছাকাছি নয়, একেবারে গায়ে গায়ে। আমি জীবনে কখনও একসঙ্গে এতো মানুষকে প্রাকৃতিক কর্ম সারতে দেখি নি। অথচ ঝাপসা নিয়ন আলোয় যেটুকু দেখতে পাচ্ছি, তাতে মনে হচ্ছে না যাঁরা ওখানে প্রাকৃতিক ডাকের মিছিলে সামিল হয়েছেন, তাঁদের কারুর এতোটুকু অস্বস্তি কিংবা সংকোচ রয়েছে। পার্শ্ববর্তী কিংবা পার্শ্ববর্তিনীর সঙ্গে টুকটাক কথাবার্তাও চলছে। টুপটাপ জ্বলে ওঠা ধূমপানের বস্তুটিও বোধহয় হাত বদল হচ্ছে।

শিহরণ খেলে বেড়াচ্ছে আমার শরীরে। ঘৃণা কিংবা দুর্গন্ধে নয়। এ শিহরণ এক ব্যাখ্যাতীত অনুভূতির। সারা পৃথিবী চুঁড়ে

ফেললেও বোধহয় ভারতবর্ষেরই মাত্র কয়েকটি জনপ্রিয় তীর্থস্থান ব্যতিত এ দৃশ্য চাক্ষুষ করা সম্ভব নয়। আজকের দিনে এ জাতির পুণ্যচেতনা কতখানি প্রবল যে নগ্নতা এবং শারীরচেতনা একেবারে নস্যাৎ হয়ে গেছে। আড়ালে লুকোবার প্রয়োজন হয় নি, কারণ হয়তো এই যে মনের সুধা আর টগবগ করে ভিতরে ফোটা আনন্দ অনভ্যস্ত দৃষ্টিটা সরিয়ে নিয়েছে। তাড়া এখন সকলের। ব্রাহ্ম-মুহূর্তটা যেন পেরিয়ে না যায়।

মনে মনে বলছি, হে পুণ্যকামী ভারতবাসী, তোমার পায়ে শতকোটি প্রণাম। আমি নিজে তোমাদের একজন হয়েও বুঝি কণামাত্র হদিশ পাই নি। তোমাদের বোধ ধর্ম বিশ্বাসের ঠিকানা খুঁজে পাই নি। মিল গরমিলের আলো আঁধারে নিজের ঘরেই আমি দিশাহারা। যে ভাব রসের ধারায় সিঞ্চিত উদ্বেল তোমরা একটি প্রভাতের জন্যও দ্বিধাহীন ভাবে অঙ্গের বস্ত্র আর লাজলজ্জা ত্যাগ করতে পেরেছো, জ্ঞান হওয়ার পর থেকে সচেতনভাবে তা পারলাম না। আমি সেই রসের সন্ধান করতে পারলাম না, যা স্বতঃস্ফূর্তভাবে একটি দিনের জন্য হলেও নিজেকে একাকার করে দিতো, চর্মচক্ষুর লজ্জা থেকে নিজেকে বিস্মৃত করতে পারতো।

ওদিক ছেড়ে ঘুরে এলাম ডান দিকে। মনে হলো পূব আকাশে অতি ক্ষীণ স্বচ্ছতার আভাস। এক নতুন বাতাস ধেয়ে আসছে সমুদ্র থেকে। ভোরের হাওয়া। আগেও হাওয়া দিচ্ছিল, কিন্তু প্রকৃতি যেন পৃথকভাবে প্রভাতকে চিহ্নিত করে অন্য একরকম হাওয়ায়, যাতে কনকনানির সঙ্গে মিশে থাকে স্নিগ্ধতা। গায়ে লাগলেই বোঝা যায় একটি রাত্রির অন্ধকার শেষ হয়ে এই বাতাসের সঙ্গে আসবে ঊষার আলো।

ব্রাহ্মমুহূর্ত এগিয়ে আসছে বলেই পুণ্যার্থীদের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। দশ মিনিট আগেও ঘাটের কাছাকাছি যে চেহারা ছিল, এখন সেখানেই জনসমাগম যথেষ্ট বেশি। আর সেই সঙ্গেই বেড়েছে

ধোঁয়ার তাণ্ডব। সব আগুনের কুণ্ডলীর ওপর পড়েছে এলোপাথাড়ি জলের ঝাপটা। হু হু করে শুধু ধোঁয়া উঠছে এখানে সেখানে জুট-মিলের চিমনির মুখের মতো। চোখ খুলে রাখতে পারছি না। জ্বালা করে জল আসছে। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। ধোঁয়ার সঙ্গেই কিছু কুয়াসা মিশে এক ধূসর আবরণ সৃষ্টি হয়েছে সাগরদ্বীপ ঘিরে।

সোরগোল বাড়ছে। লক্ষ লক্ষ্য পুণ্যার্থীর গতি পাড়ের দিকে। জ্বালা করা চোখ রগড়াতে রগড়াতে চললাম সেইদিকে। হিমপড়া ঠাণ্ডা বালি আর ধোঁয়াসার মধ্যে বসে পড়েছে শ'য়ে শ'য়ে ভিখারি, কুষ্ঠ-রোগী। চেনা অচেনা বিভিন্ন ধরনের ঠাকুর দেবতার মূর্তি সামনে। আবছা অন্ধকারে রাস্তা তৈরি করে নিয়ে এগুতে লাগলাম জলের দিকে। ডাকাডাকি চিৎকার চেঁচামেচি চলছে সমানে। ইতিমধ্যে তার সঙ্গেই ঠেলাঠেলি। চরের সমস্ত মানুষ উজাড় হয়ে এগিয়ে আসছেন পাড়ের দিকে।

নিক্ষিপ্তভাবে এপাশ ওপাশ থেকে নানা কণ্ঠস্বরে ভেসে আসছে "গোদান, গোদান"। পাঁচসিকি পয়সা দিয়ে বাছুরের লেজ ধরে বৈতরণী নদী পার হওয়ার আহ্বান। কী ব্যাপার সেটা জানতাম না। মহাভারত নাড়াচাড়া করার সময় যেটুকু দেখেছি যে পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদী এবং একটি সারমেয় সহ যুধিষ্ঠিরই একমাত্র সশরীরে স্বর্গারোহণ করতে পেরেছিলেন এবং স্বর্গে প্রবেশের পূর্বে তিনি বৈতরণী নদী পার হয়েছিলেন।

"এই বৈতরণী নদী পরম নির্মল।
উত্তর হইতে বহে দক্ষিণ মণ্ডল॥
দক্ষিণ শমনপুরে বড়ই তরঙ্গ।
পাপী পার হতে নারে, দেখি দেয় ভঙ্গ॥
মর্তেতে যোগদান করে যেই পুণ্যজনে।
সুখে পার হয়ে যায় নৌকা আরোহণে॥"

সুতরাং পৌষ সংক্রান্তির দিন গঙ্গাসাগরে ডুব দিয়ে স্বর্গপ্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য তার আগে বৈতরণী নদী পার হওয়াও অতি গুরুত্বপূর্ণ। সেক্ষেত্রে একটি মন্ত্রপূত গোশাবকের পুচ্ছ আকর্ষণ করে গোদান পর্ব সমাধা করে ফেলা এবং বৈতরণী নদী পার হয়ে যাওয়াটাই বুদ্ধির কাজ। হাতের কাছেই একেবারে পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত। অনেকেই একটি সাজানো বাছুর, যার কপালে সিঁদুর, চেরা ক্ষুরে আলতা, গলায় ফুলের মালা ইত্যাদি নিয়ে "গোদান গোদান" বলতে বলতে পাড়ের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

আসলে আমার মনগড়া ধরণাটা ছিল একটু অন্যরকম। মুস্কিলটা হলো সেখানেই। আমি ধরে নিয়েছিলাম, নিশ্চয়ই কাছেপিঠে ছোট কোনো খাল কিংবা নালা জাতীয় কিছু একটা আছে, যাকে বৈতরণী নদীর বিকল্প হিসাবে ধরা হয়। এবং পুণ্যার্থীরা বাছুরের লেজ ধরে সেই নালাটাই এপার থেকে ওপারে যান এবং ধরে নেন তাঁরা বৈতরণী নদী পার হয়ে গেলেন। সুতরাং এবার স্নান করে নিলেই স্বর্গপ্রাপ্তি অবধারিত।

আমি যে কেন কিজন্য এরকম একটা ছবি কল্পনা করে নিয়েছিলাম জানি না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সেরকম কোনো ব্যাপার ঘটছে না দেখে একদিকে আবার কিঞ্চিত দ্বিধাতেও পড়ে গেলাম। বৈতরণী নদী পার হচ্ছে কী প্রকারে! অথচ আমার চোখের সামনেই একটি ভোজ-পুরী পরিবার নদী পার হচ্ছেন।

আমি ওঁদের একটি বাইশ-চব্বিশ বছরের যুবককে জিগ্যেস করেই ফেললাম—আচ্ছা ভাই, ও বৈতরণী নদী কেইসে কিধর পার হোতা হ্যায়? (আমার হিন্দিজ্ঞান মার্জনীয়। কথার শেষে "হ্যায়" লাগিয়ে দিলেই আমরা ধরে নিই খানিকটা হিন্দি বলে ফেলেছি।)

যুবকটি তার ভাষায় আমাকে যা বোঝালো—এই তো এখানেই কত-জন পুরোহিত গাভী নিয়ে ঘুরছে। এরাই গোদান করিয়ে বৈতরণী পার করাচ্ছে। তুমিও একটাকা চার আনা দিয়ে পার হও।

—লেকিন, ও নদী কিধর ? সামনে যে তো খালি সমুদ্র হ্যায়।— বোকার মতো প্রশ্ন করলাম।

যুবকটির ভ্রূ কুঁচকে কপালে রেখা ফুটে উঠলো। আমার প্রশ্নে সে নিজেই হতবুদ্ধি যেন। এদিকে পুরো ব্যাপারটি আমার কাছেও অত্যন্ত অস্পষ্ট। আমি তাকে আবার বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলাম।

—শুনিয়ে ভাই, আদমীলোগ সব বৈতরণী নদী পার হোগা, ও কিধর সে কিধর যায়েগা ?

ছেলেটি এবার যা উত্তর দিলো তা আমাকে আরও বেশি জটিল আবর্তে টেনে নিয়ে গেল। তার কথার অর্থ আমি যেটুকু বুঝলাম, তা এই : কোথায় যে যায়, সে কি আর বলা যায় দাদা ! বোধহয় যেখান থেকে এই মানুষ জীবজন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি সেখানেই আবার ফিরে যায় !

ব্যাস্। ছেলেটির হাত মুখ নাড়া মুখের ভঙ্গি দেখে মুহূর্তেই বুঝতে পারলাম, আমি যেখানে আমার অজ্ঞানতার দরুণ একটি অতি প্রত্যক্ষ বাস্তব পদ্ধতির কথা জানতে চাইছি, এই যুবক সেইখানে তার নিজস্ব আধ্যাত্মিক বোধের কথাটুকু আমায় সরলভাবে জানাতে চাইছে।

বেশ দমে গেলাম। কী বলবো। আমার অক্ষমতা, আমি যুবকটিকে আমার প্রশ্নটাই ঠিক বোঝাতে পারি নি।

ভারতের আঞ্চলিক ভাষা সম্পর্কে আমরা কত উদাসীন, নিজেদের দেশের লোককে মনের কথাটুকু বোঝাতে পারি না। আমাদের ভাব বিনিময় কী করে হবে !

একটি অল্পবয়সী মেয়ে, যুবকটির বোন-ও হতে পারে, অনেকক্ষণ থেকে আমাদের কথোপকথন শুনছিল। সম্ভবত আমার দমে যাওয়া ব্যাজার মুখখানা দেখেই এবার খিলখিল করে দিব্যি হেসে উঠলো। একই সঙ্গে অবাক এবং অপ্রতিভ আমি। একেই ব্যাপারটা বুঝলাম না, তার ওপর মেয়েটা হেসে যেন আমার জ্ঞানের অভাবকেই বিদ্রূপ

করলো। চলে আসছিলাম ওদিক থেকে। মেয়েটা আমায় ডাকলো। না, আমি যা ভেবেছিলাম তা নয় বরং উল্টো। মেয়েটা আমার সমস্যাটা বুঝেছে। সে তার মিশ্র ভাষা, ভঙ্গি এবং হাত মুখের নাড়াচাড়া দিয়ে সহজেই আসল ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলো।

যা বুঝলাম: এখানে নদীনালা পার হওয়াটা আসলে সিম্বলিক। গাই কিংবা বাছুরের লেজ ধরার সময় পুরোহিত কিছু মন্ত্রোচ্চারণ করবে। তাতেই গো-দান করা হলো বলে ধরে নেওয়া হবে। সুতরাং বৈতরণী নদী পার হওয়ায় আর কিছু বাধা থাকলো না। এরপর সাগরে ডুব দিলে স্বর্গপ্রাপ্তির ব্যবস্থাও হয়ে রইলো।

—কা ভইল, অব সমঝে ?—মেয়েটি মিটমিট হাসি আর ঘাড়ে ঝট্‌কা দিয়ে জিগ্যেস করলো।

বললাম—হ্যাঁ, আভি সমঝ গিয়া।

আর কিছু বললাম না। মনে মনে মেয়েটির সহজাত এবং স্বাভাবিক বুদ্ধির প্রশংসা করলাম। সংসারের অনেক ক্ষেত্রেও আমরা যেখানে বেশ ধাঁধায় পড়ে যাই, প্রায়শই দেখি, বাড়ির মেয়েরা হেলাফেলায় সেসব জট খুলে ফেলে।

জলের ধারে এসে পড়েছি। বেলাভূমি ভিজিয়ে ছুটে আসছে সমুদ্রের জল। কাতারে কাতারে পুণ্যার্থীরা নেমে পড়েছেন সঙ্গমের পুণ্য-সলিলে। ব্রাহ্মমুহূর্ত আসন্ন। ঢেউ ভাঙা ফেনা নিয়ে ছুটে আসা জলের সঙ্গে ভেসে আসছে গাঁদা ফুল আম্রপল্লব ডাব পানসুপারি, খুচরো পয়সাও নিশ্চয়ই। ঠাণ্ডা আর বাতাস উপেক্ষা করে একপাল ছোট ছোট ছেলে প্রবল উৎসাহে নেমে পড়েছে ঢেউ-এ ভেসে আসা পুজাপোচার সংগ্রহে।

আকাশে স্পষ্ট ফ্যাকাশে ঘষাভাব। যেন খড়ি দিয়ে লেখা ব্ল্যাকবোর্ড কাপড় দিয়ে মোছা। এতোক্ষণে চোখে পড়লো হালকা সোনালি রং-এর কাঁচা কুমড়ো ফালির মতো একটি কাস্তে চাঁদ জেগেছে, বিলবিলে শুকতারার পাশে। অপূর্ব, অপূর্ব! সামনেই সীমাহীন জল-

রাশি দুলছে। সামনে আর কিছু নেই। দূরে, বহুদূরে যেখানে আকাশ আর জলের মেশামিশি, ক্রমশ সেখানে ফুটে উঠছে একটি ধূসর রেখা—আকাশ আর সমুদ্রের মাঝখানে। বাতাস উঠছে পাক খেয়ে।

পুণ্যার্জনের চরম মুহূর্ত। স্বর্গ থেকে আনন্দ আর শান্তির অদৃশ্য পুষ্পবৃষ্টি হয়ে চলেছে অঝোর ধারায়। বৃদ্ধা মাকে পিঠে করে নিয়ে ডুব দেওয়াচ্ছে প্রৌঢ় ছেলে। ছ মাসের ন্যাংটো শিশুকে হৃষ্ট-পুষ্ট আণ্ডারপ্যাণ্ট পরা বাবা নোনা জলে চুবিয়ে তুলছেন। পৃথুলা স্ত্রীর হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন স্বামী, সঙ্গমের পবিত্র প্রবাহে গা ভেজাবে। অন্ধ স্বামী-স্ত্রী নিজেদের ভরসায় কোমর জলে এগিয়ে যাচ্ছেন। উল্লাস আর পাঁচমিশেলি কোলাহলে মুখর হয়ে উঠেছে সমস্ত এলাকা। রোগা বাছুরের লেজে টান পড়ে ব্যথা লাগছে, ডাক ছাড়ছে হাম্বা হাম্বা। শিশু কাঁদছে, মহিলা শাড়ি সামলাচ্ছেন। খোল খঞ্জনী বাজিয়ে তারস্বরে কীর্তন চলছে। ঠাণ্ডায় কাঁপা হাতে বোল ঠিক থাকছে না, তবু বাজনা চলছে। পুরোহিতের হাতে ঘণ্টা নড়ে যাচ্ছে। ভেজা বালির ওপর উটকো হয়ে বসে পড়েছেন অনেকে। সামনে ঘর কাটা, চাল কলা তিল মেখে পূর্বপুরুষের পিণ্ডদান হচ্ছে। সাষ্টাঙ্গে উলঙ্গ একজন শুয়ে পড়েছেন বালিতে। হাত পা ছুঁড়ে কাতরাচ্ছেন আর শুধু কেঁদে চলেছেন। কী তাঁর দুঃখ কেউ জানে না। জানার তাগিদ অবসরও নেই কারুর। অনেকে তাঁকে টপকে চলে যাচ্ছেন। তিনজন মহিলার আড়ালে ভেজা কাপড় ছাড়ছেন আর একজন। সামনে জলের মধ্যে থিকথিক করছে হাজার হাজার মানুষ, ঘোলা জলের মধ্যে হুটোপাটি করে চলেছে অগুনতি অসংখ্য মানুষের হাত পা মাথা। স্নান করিনি আমি, কিন্তু তার মধ্যেই ভিজে ঢোল। চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে লবণাক্ত জলের ঝাপটায়। তবু তাকিয়ে আছি, এ দৃশ্য আর দেখতে পাবো না—মুখোমুখি বিক্ষুব্ধ উল্লসিত দুই সমুদ্র। আলিঙ্গনে উদ্বেল গঙ্গা-

সাগর আর মানব সাগর। সঙ্গম বুঝি স্বর্গ আর মর্ত্যেরই। এই বুঝি মিলনের সেই চরম অবস্থা যার অনন্দানুভূতিতে দূর হয় গ্লানি মলিনতা লজ্জা ক্লান্তি। দেখতে পাচ্ছি চোখের ওপর আঁধার কেটে আকাশ থেকে নেমে আসছে নতুন প্রভাতের আলো, রং। লালচে আভা পড়ছে জলে, যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু চিক চিকিয়ে উঠছে শত সহস্র রুপালি রেখায় দূরের ঢেউ।

আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি তারা নেই। সাদা ম্রিয়মান একফালি চাঁদ তখনও রয়েছে দুধে আলতা আকাশে। পূর্বদিকে মুঠো মুঠো লাল আধার ছড়িয়ে সূর্যদেব দেখা দিচ্ছেন মাত্র। চোখে পড়লো মাস্তুল দাঁড় করানো শত শত নৌকা দুলছে। মাঝরাতে ভাঁটার টানে ভেসে এসেছে।

পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতেই একজনকে দেখে দাঁড়ালাম। আশা করিনি ঠিক এমনই একজনকে গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নান করতে আসতে দেখবো। নিশ্চিত হওয়ার জন্যই একটু কাছে এগিয়ে গেলাম। না, ভুল হয়নি ভারতবিখ্যাত গইনোকলজিষ্ট-কে চিনতে। অবাক লাগার সঙ্গে করুণা মেশানো অন্য এক ধরনের অনুভূতিও হলো। আমার কলেজের অধ্যাপক, নিখুঁত কাটছাঁটের স্যুট টাই ছাড়া কখনও পরতে দেখিনি, মুখে চোস্ত ইংরেজী ছাড়া বাংলা শুনিনি। ক্লাসে ওঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কখনও বাংলা বলে ফেললে, উনি রিমলেস সোনালি চশমার ওপর দিয়ে ভ্রূ তুলে তাকাতেন। ইংরেজীতে বলতেন—"আমার সামনে বাংলা বলে নিজের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ কোরো না।" তাঁর ভাবভঙ্গি আচরণ সব কিছুতেই প্রকৃতপক্ষে এমন এক দাম্ভিক আত্মম্ভরিতা ছিল যে মনে হতো তিনি যেন খুব দয়া করে আমাদের দেখা দেন এবং অধ্যাপনায় এই মেডিকেল কলেজকে তিনি ধন্য করছেন। তাঁর মতো স্মার্ট পণ্ডিত মানুষ এখন একটি অপরিচ্ছন্ন দুর্দশাগ্রস্ত ভারতীয় মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক হিসাবে খুবই অনুপযুক্ত। আমরা তাঁকে কখনই বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার

মাস্টারমশাই বলে মনে করতে পারিনি।

এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে মানুষটা দুঃখী। জীবনের গভীর গোপন কোনো একটা জায়গায় বোধহয় তাঁর চূড়ান্ত ব্যর্থতা এবং জ্বালা যন্ত্রণা আছে। ওপর ওপর সেটাকে চাপা দেওয়ার জন্যই লোক দেখানো স্মার্টনেস-এর বাড়াবাড়ি। নয়তো এমন মানুষ সাগরে আসেন কেন!

দেখতে পাচ্ছি দীর্ঘদেহী ফর্সা লালকান সেই মানুষটির পরণে এখন একফালি গামছা। খালি গা। ভিজে কাঁচা-পাকা মাথার চুল আর বুকের রোম থেকে টুপিয়ে ঝরে পড়ছে জল। অঞ্জলিবদ্ধ দুহাত বুকের সামনে। চক্ষুমুদে হাঁটুজলে আমার থেকে মাত্র কয়েক হাত তফাতে দাঁড়িয়ে তিনি বলছেন—"দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে।..."

ভাবলাম অপেক্ষা করি ওঁর স্তোত্রপাঠ শেষ হওয়া অবধি। কিন্তু না, মুহূর্তেই মত বদল করলাম। লাভ কী আমার ওঁকে একটু অপদস্থ হওয়ার সুযোগ দিয়ে! অহেতুক বিব্রত বোধ করবেন আমার সামনে। আমিই বা ওঁকে কী জিগ্যেস করবো এবং কী জানবো নতুন করে! নীরবে যেটুকু জানা বা বোঝার তা তো ওনাকে দেখতে পেয়েই মিটে গেল। এই বেশ।

সকালের নরম রোদ উঠছে লম্বা ছায়া ফেলে। শুকনো চরের দিকে উঠে এলাম। মেলার অবস্থা আবার প্রায় গতকাল সন্ধ্যার মতো ভিড়ে তালগোল পাকানো দিশেহারা গোছের হতে চলেছে। স্নান-সারা যাত্রীদের লক্ষ্য এখন আবার কপিল মুনির মন্দির। পুণ্য অর্জনের শেষ পর্ব—ভিজে কাপড়ে পবিত্র মনে পুজো দেওয়া।

পদে পদে ভিড়ের বাধায় থমকে যাচ্ছি। হাজার-হাজার ভিখারি মড়াকান্না কেঁদে কেঁদে শেষ মুহূর্তের ফায়দা তুলছে। পুণ্যার্থীরা অনেকেই নিজেদের ঝোলা থেকে সার বেঁধে বসে থাকা ভিখারিদের পাতা গামছার ওপর মুঠো করে চাল ডাল দিতে দিতে চলেছিল।

ফলমূল মুড়ি নকুলদানা নিয়ে দোকানীরা এখন যে যেখানে পেরেছেন বসে পড়েছেন। মিলন মেলা ভাঙতে চলেছে, শেষ মুহূর্তের বেচা-কেনা, সুতরাং নিয়ম কানুন এখন সব শিকেয় উঠে গেছে। অনেকে এখনও চরে বসে পুজো করে চলেছেন, কেউ বা এর মধ্যেই ফেরার বাস ধরতে ছুটছেন। হৈ হৈ কীর্তন গানবাজনা চলছে যত্রতত্র এবং উচ্চমার্গে। ডুগিতে খেমটা নাচের বোল উঠেছে কোথাও। ভাব-খানা—স্নান সারা হয়েছে, এখন মন মেজাজের আলাদা মস্তি! তথ্যকেন্দ্রের মাইক অসম্ভব জোরে গলা ফাটাচ্ছে। কতজন হারিয়ে গেছেন তার ইয়ত্তা নেই। কোন্ এক আশ্রমের মহারাজকেও পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্নান সেরে অপেক্ষা করছেন কিন্তু তাঁর গাড়ির ড্রাইভার তখনও পেঁছাননি বলে পুলিশ, স্বেচ্ছা-সেবীরা খুব দৌড়ঝাঁপ করছেন।

ভিড়ের মধ্যেই গোল বেধেছে এক জায়গায়। শিড়িঙ্গে চেহারার এক পুরোহিত সেখানে চিৎকার করে কিসব বলতে বলতে উন্মত্ত নৃত্য শুরু করেছেন। কাছে যাওয়া খুব কষ্টকর কেননা অসম্ভব ঠেলাঠেলি সেখানে। পুরোহিতের চিৎকার আর লম্ফঝম্প-তে লোক জুটছে সেখানে। চাকবাঁধা ভিড়ের মধ্যেই কিছু একটা রয়েছে মনে হওয়ায় ঠেলেঠুলে মাথা গলিয়ে দিলাম।

দেখি অশীতিপর এক অবাঙালী বৃদ্ধা শুয়ে রয়েছেন বালির ওপর। কোঁচকানো ঢিলে অনাবৃত গায়ের চামড়া। কোমরের কাছে একফালি ন্যাকড়ার মতো ধুতি কিংবা শাড়ি। হয়তো আরও আগে স্নান সারা হয়েছিল, এখন নোনা জল শুকিয়ে সাদা সাদা এলোমেলো রেখায় নুন ফুটে উঠেছে গায়ে। অনাবৃত পায়ের পাতা দুটি ফুলে গোল। মাথায় শনের নুড়ির মতো পাকা ধূসর চুলে জট ও বালি। সহস্র আঁকিবুকি কাটা মুখের রেখা সব স্থির। আধখোলা চোখ কোটরে, পাতা পড়ছে না। মুখগহ্বরে ফাঁক, ঠোঁটের দুপাশে ঘা। কয়েকটা মাছি উড়ছে নাক মুখের সামনে। সমতল বুকের দুপাশে ঝুলো

ডুমো মাছির মতো দুটি স্তনবৃন্ত জেগে রয়েছে। বুক পেটের ওঠা-নামা নেই। নিস্পন্দ, স্থির।

শিড়িঙ্গে পুরোহিত চিৎকার করছে—আদমীলোগ সব দেখ যাও, বুড়ি মাইকি স্বর্গপ্রাপ্তি! আ যা, আ যা। ভব নদী কে পার···।

ভিড় বাড়ছে চাপ বাড়ছে, সেই সঙ্গে খুচরো পয়সা পড়ছে। পুরোহিত কয়েকবার গলা ফাটিয়ে চিৎকার করেই মাটিতে বসে পড়ছে। বালির ওপর থেকে পয়সা কুড়িয়ে কোঁচড়ে ভরে আবার হাত পা ছুঁড়ে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

নিশ্চল বৃদ্ধার পায়ের কাছেই খালি গা অবিন্যস্ত কাঁচাপাকা চুল এক প্রৌঢ়, কিছুটা বিব্রত কিছুটা অসহায় এক ধরনের মুখে বসে রয়েছে। তার গ্রাম্য দেহাতী মুখচোখ দেখে মনে হয় না পরিবেশ সম্পর্কে সে যথেষ্ট সচেতন। রাতজাগা লালচে ছল ছল চোখে কেবলই সে পুরোহির্তের দিকে তাকাচ্ছে এবং বিড় বিড় করে কিছু একটা জানার চেষ্টা করছে, কিন্তু সুযোগ পাচ্ছে না।

একবার তাকে পুরোহিতের উদ্দেশ্যে বলতে শুনলাম—এ ঠাকুর, অব মেরা মাইজীকে কেয়া হোগি?

পুরোহিত ভীষণ ব্যস্ত। বালির ওপর থেকে দ্রুত পয়সা কুড়িয়ে নিতে নিতে বললো—ওরে মুখ্যু, মাইজি তোর অনেকক্ষণ অগেই পটল তুলেছে। আভি যেত্‌না পারেগা, পয়সা উঠা লে।

মুহূর্তের মধ্যে পুরোহিত আবার মাথর ওপর দু হাত তুলে লাফিয়ে লাফিয়ে চিৎকার শুরু করে দিলো।

—দেখ্‌ যাও, ভাইসব, দেখ যাও। সঙ্গম মে স্বর্গপ্রাপ্তি।···

প্রৌঢ় লোকটির হাতের কাছে একটি পোঁটলা ছিল, আর একটি লাঠি। বুড়ো পুরোহিতের কথা এতোক্ষণ ধরে সে কী বুঝেছে সে-ই জানে। কিন্তু এবার দেখলাম সে লাঠি আর পোঁটলাটি সঙ্গে নিয়ে ছেলে-মানুষের মতো কাঁদতে কাঁদতে উঠে দাঁড়াল। হয়তো এতোক্ষণ পরে সে বুঝতে পেরেছে তার মা আর জীবিত নেই।

ঠেলাঠেলি ভিড়ের চাপ অসম্ভব বেড়েছে। এমনিতেই দিক্‌ভ্রান্ত যাত্রীরা কে কোথায় কোন্‌দিকে যাচ্ছেন তার ঠিক নেই। রাস্তাঘাট সব দখল হয়ে গেছে। যেখানে সেখানে কীর্তন কিংবা গান বাজনা চলছে। চলছে ভেলকি দেখানো, রীতিমত বাজার হাট কেনাবেচা। গোলমাল চিৎকার ডাকাডাকি সব তুঙ্গে।

দেহাতী প্রৌঢ় লোকটির সঙ্গে আমিও বেরিয়ে এলাম সেই জমাট বাঁধা ভিড়ের মধ্য থেকে। দেখলাম লোকটি অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে পাড়ের দিকে চলেছে। জানি না সে মাতৃদায় থেকে উদ্ধার পাওয়ার ডুব দিতেই যাচ্ছে কী না। খুব স্বাভাবিক কারণেই মনটা বিষাদে ভরে উঠলো এই ক' মিনিটেই। হয়তো বিহার কিংবা উত্তরপ্রদেশের কোনো সুদূর গ্রাম থেকে লোকটি তার মাকে গঙ্গাসাগরে ডুব দেওয়াতে নিয়ে এসেছিল এক পরমপ্রাপ্তির আশায়। বুড়ো মানুষ সেই ধকল এবং কষ্ট সহ্য করতে পারলেন না। ইহলোকই ত্যাগ করে চলে যেতে হলো। লোকটির পুণ্যচেতনা কি তার এই মাতৃবিয়োগের শোককেও কাটিয়ে উঠবে!

বালির ওপর দিয়ে এলোমেলো হাঁটতে হাঁটতে ফিরে চললাম আমাদের সরকারী কোয়ার্টার্স-এর দিকে। স্নান দেখা হয়েছে। দেখা হলো আরও অনেক কিছু। মনের অবস্থাটা ঠিক কেমন, আনন্দিত না দুঃখিত, বিষণ্ণ নাকি পুলকিত, নিজেও এই মুহূর্তে বুঝতে পারছি না। শুধু বহু মানুষের ব্যস্ততা উল্লাস আর আনন্দের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছি।

কি আশ্চর্য, সাগরদ্বীপে একটাও কাক নেই!

আমাদের কোয়ার্টার্স-এর কাছাকাছি আসতে দেখি রীতিমত ফেরার তাড়া। নিজেদের আত্মীয়স্বজন লোকজন নিয়ে ছোটাছুটি করছেন অনেকে। কেউ কেউ এর মধ্যেই ব্যাগ বোঁচকা গুটিয়ে গেট পেরিয়ে বেরিয়ে আসছেন। কেউ আবার হাতে খাবারের ঠোঙা নিয়ে ভিতরে

ঢুকছেন। স্নান পুজো সব শেষ। মুখে কিছু দিয়েই আবার বেরুতে হবে। ভেজা মাথার চুল, গায়ে শাল কিংবা গরম জামা, চোখে মুখে যুদ্ধ জয়ের চকচকানি।

আমাদের নির্দিষ্ট হোগলা ঘরের সামনের দরজাটি খোলা। মিস্টার ম্যাথুজ কিংবা আর কারো গলার আওয়াজ পেলাম না। সব চুপ-চাপ। কী ব্যাপার! এখনও সব ঘাটে স্নান করছেন নাকি! ঘুম থেকে নিশ্চয়ই উঠে পড়েছেন। কয়েকটি ঘর খালি হয়ে গেছে ইতি-মধ্যে। বাকীরাও তৈরি হচ্ছেন।

দরজার সামনে এসে গলা খাঁকারি দিলাম। তারপব আস্তে ডাকলাম —মিষ্টার ম্যথুজ।

না, কোনো উত্তর নেই।

গতকাল প্রথমে যে ঘরটিতে উঠেছিলাম, সেই ঘরের দরজা ভেজানো। আস্তে ঠেলতেই খুলে গেল। ঢুকে পড়লাম ভিতরে। কেউ নেই, ফাঁকা। গত রাত্রেও যে টেবিল এবং খাটের ওপর ছিল স্তূপীকৃত জিনিষপত্র এখন সেসবই শূন্য। কিচ্ছু নেই। শুধু ন্যাড়া কাঠের টেবিলটার ওপর আমার ব্যাগ। এগিয়ে গেলাম কাছে। যে ঘরটায় এতোগুলো লোক ছিল এখন সেখানেই একলা ঢুকে অসম্ভব ফাঁকা লাগছে। বিচুলির ওপর পড়ে রয়েছে দু একটা টুকিটাকি কাগজ একটা ফাঁকা জলের বোতল। ইলেট্রিক বাল্‌বটা জ্বলছে। ঘরের বাতাসের মধ্যে কেক বিস্কুট জাতীয় খাবারের গন্ধও রয়েছে এখনও। নিশ্চয়ই চলে গেছেন ওঁরা। তবু যেন একবার দেখা হবে, আমার এ ধরনের একটা অবচেতন মানসিক প্রস্তুতি নিশ্চয় ছিল। নয়তো এতোটা খালি খালি লাগতো না।

গায়ের কম্বল খুলে নিলাম। ভাঁজ করে ব্যাগের মধ্যে ভরতে গিয়েই দেখি, নিচে চাপা দেওয়া এক টুকরো সাদা কাগজ। তুলে নিলাম কাগজ। চিঠি লিখে রেগে গেছেন সাহেব। বাচ্চাদের মতো বোগড়া বোগড়া অক্ষরে বাংলায় চিঠি। কোনো সম্বোধন নেই, কিন্তু চিঠি

যে আমারই উদ্দেশ্যে বুঝতে অসুবিধে হয় না কিছু।

"আমরা ফিরিয়া যাচ্ছি। এখন বাহির না হইলে, হাওড়া হইতে সন্ধ্যার গাড়ি পাবো না। আপনার সঙ্গে যাওয়ার পূর্বে একবার সাক্ষাৎ হইলে সুন্দর অনুভব করতাম। না হওয়াতেও আর দুঃখ কী! মনের আলোয় আমাদের দেখা হইয়াছে। সেই উদ্দেশ্যেই তো মানব সঙ্গমের মেলায় আসা। আমার মনের এক নিরবধি যন্ত্রণার কথা গতকাল আপনাকে জানিয়েছি, তাহাতে ভুল বুঝিবেন না। বেলা আপনার ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছে। আমরা সকলে আপনার সান্নিধ্যে খুশি হইয়াছি। বেলা আপনার ব্যাগের মধ্যে কিছু প্রাত-রাশ রেখেছেন। প্রয়োজনে ব্যবহার করবেন। ইতি—

শ্রীক্রিস্‌টোফার ম্যাথুজ।"

চিঠিটা ভাঁজ করে রেখে কম্বল ঢোকানোর আগেই ব্যাগ খুললাম। নিচে তোয়ালে জুতো ইত্যাদির ওপর কয়েক ভাঁজ খবরের কাগজ রেখে, তার ওপর রয়েছে একটি ছোট কাগজের বাক্স। খুলে দেখলাম। একটি ছোট কেক, চার-পাঁচটি কাজুবাদাম একটি সন্দেশ এবং দুটি টফি। ক্ষিদে ক্ষিদে পাচ্ছিল কিন্তু এই মুহূর্তের নিঃসঙ্গতা খাওয়ার ইচ্ছেকে দূরে সরিয়ে দিলো। গতকাল রাত্রে এখানেই খেতে খেতে গল্প এবং একধরনের উত্তাপ অনুভব করেছিলাম। এখন সে জায়গাতেই একা একা দাঁড়িয়ে খাবার মুখে তুলতে পারলাম না কিছুতেই। আমার এমন কিছু গোছগাছের ছিল না। খাবারের বাক্সটা একেবারে ওপরে রেখে ব্যাগের চেন আটকে নিলাম। ফেলে যাওয়ার মতো বিশেষ কিছু আমার ছিল না। তবু ঘরের চারপাশটা চোখ বুলিয়ে নিলাম। মিস্টার ম্যাথুজের শুদ্ধ চলিত মেশান চিঠির কথাগুলো মাথায় ঘুরছিল। ওঁর "নিরবধি যন্ত্রণা" ব্যাপারটা কিরকম তা হয়তো আমি কখনও পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারবো না। কিন্তু যন্ত্রণার বৈচিত্রে ভরা মনুষ্য জীবনের যতোটুকু আমি বুঝতে পেরেছি, ওই পাদ্রীসাহেবেটি তার মধ্যে আর একটি নতুন সংযোজন।

ব্যাপারটা যেন ওঁর একার নয়, আমার কেবল মনে হচ্ছে মিষ্টার ম্যাথুজ তাঁর রুদ্ধ অন্ধকার দুঃখিত মনের একটা ছোট জানালা খুলে দেখিয়ে, প্রকৃতপক্ষে একটি শ্রেণীর জীবনযন্ত্রণার কথাই আমাকে জানিয়ে গেলেন। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষই নিশ্চয়ই কিছু না কিছু কারণে দুঃখিত। কিন্তু মিষ্টার ম্যাথুজ এবং তাঁর মতো আরও অনেকের দুঃখের ব্যাপারটায়, আমারই মনে হয়. যেন গোড়া ধরে গাছ নাড়ানোর মতো এক অনুভূতি হচ্ছে। জীবনের প্রতিটি সচেতন মুহূর্তে পায়ের তলায় ভূমিকম্প। আপন উদ্ভব অস্তিত্বের বীজ মাটিটাও চেনা জানা হলো না। আমার পক্ষে কী করে সম্ভব ভদ্রলোকের নিরবধি যন্ত্রণার স্বরূপ উপলব্ধি করা! আমার জীবনে শতরকম ঝড়ঝাপটার টালবাহানা থাকলেও মানুষ হিসাবে আমার উৎপত্তির এক নির্দিষ্ট পরিচিতি আছে—যা ধ্রুবতারার মতোই সত্য। যে বাবা মা-এর জন্য চন্দ্রসূর্য্য দেখেছি, তাঁদের অণু পরমাণু প্রতি-নিয়ত আমার রক্ত কণিকায় প্রবাহিত—এইবোধ এবং উপলব্ধি আমার পায়ের নীচে মাটি শক্ত করে। মিষ্টার ম্যাথুজ সেই উপলব্ধির সন্ধান করে ফিরছেন আজীবন।

কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ঘর থেকে বেরুবার আগে অজান্তেই একবার হাত উঠে গেল কপালে। জানি না কার উদ্দেশ্যে। বাইরের দরজার শিকলে তালাচাবি ঝুলছিল। তালা আটকালাম। একবার মেলা অফিসে যেতে হবে, চাবি দেওয়ার জন্য। তারপর ওই পথেই ফিরে যাবো বাস ধরার উদ্দেশ্যে।

ইতিমধ্যেই বেলা বেড়েছে। কুয়াসা পুরো কেটে গিয়ে আকাশ চকচকে নীল। কোয়াটার্স-এর অধিকাংশ মানুষজনই বেরিয়ে পড়েছেন। মাত্র কয়েকটা ঘরেই মনে হলো তাড়াহুড়ো করে বাঁধাছাঁদা চলছে।

বালির ওপর পা দিয়ে মাত্রই কয়েক পা এগিয়েছি। পিছন থেকে ডাক।

—হ্যাঁ বাবা, বাড়ি ফিরে চললে, বাড়ি ?

মনে হলো কথাটা আমাকে উদ্দেশ করেই। ঘাড় ফেরালাম। দেখি, বয়সের ভারে কিছুটা ঝুঁকে পড়া, ফর্সা এক বৃদ্ধা। সাদা থানের ওপর দামী শাল জড়ানো, ভেজা রুপোলি চুল মাথার ওপর দিয়েও। খালি পা। হাতে একটা শিশি। ফোকলা মুখে হাসি হাসি ভাব। বালির ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছেন আমার দিকে। ঠিক মনে করতে পাবলাম না ওঁকে আগে দেখেছি কিনা। তবে আমাদের কোয়াটার্স চত্বরেই কোনো ঘরে নিশ্চয়ই উঠেছেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে রইলাম। উনি কাছে এসে আবার বললেন—বাড়ি ফিরে চললে ?

বললাম—হ্যাঁ, আস্তে আস্তে এগোই এবার। বাস ধরবো তো।

ভদ্রমহিলা কেন কিজন্য আমাকে জিগ্যেস করলেন বুঝলাম না। ধরে নিলাম, এমনিই বুড়ো মানুষ আমার মতো এমন একজন যাকে ঠিক তীর্থযাত্রী বলে হয়তো বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না, দেখে ডেকেছেন। নিজের থেকেই জিগ্যেস করলাম—আপনারা যাবেন না ?

—হ্যাঁ বাবা, যাবো। ওই ছেলে গ্যাছে অফিসে জীপ গাড়ির বন্দো-বস্ত করতে, তাই…

কথা বলতে বলতেই বৃদ্ধা যেন আমাকে নিরীক্ষণও করছেন মনে হলো।

বললাম—ওহ্ আচ্ছা। আপনারা আসুন তাহলে, আমি এগোই।

—আচ্ছা, বাবা, আচ্ছা।—বৃদ্ধা জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজালেন।

উল্টো দিকে ফিরে এগুতে যাবো, আমাকে পুরো তার সুযোগ না দিয়েই বৃদ্ধা আর একটু এগিয়ে এসে হঠাৎ বললেন—হ্যাঁ বাবা, ইয়ে…তোমায় একটা কথা জিগ্যেস করবো ?

একটু অবাক লাগলো আমার। ভালোভাবে ওঁর সামনে দাঁড়িয়ে খুব অমায়িক ভাবেই বললাম—হ্যাঁ, বলুন না।

বৃদ্ধা যেন তবু একটু ইতঃস্তত করলেন। তারপর বললেন—এই এমনি আর কি....। বলছিলাম, তুমি হিঁদুর ছেলে তো!

এতোক্ষণে বুঝতে পারলাম। বৃদ্ধার কুশল প্রশ্ন করার আসল উদ্দেশ্য, উনি জানতে চাইছেন আমি হিন্দু কী না। মনটা আপনা থেকেই নিঃশব্দে একটু বিষয়ে উঠলো। তবু মুখে সেটা প্রকাশ না করে, গলা যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে বললাম—হ্যাঁ—। কেন বলুন তো!

—তোমার সঙ্গের দলবল বন্ধুরা সব খিষ্টান ছিল তো, না?

বুঝতে পারছি চেষ্টা সত্বেও আমার ভ্রূ বেঁকে যাচ্ছে। মুখে বিরক্তির রেখা ফুটে উঠছে এবং কানে গরম লাগছে।

বললাম—হ্যাঁ। ওঁরা সব খ্রীশ্চান ছিলেন। কেন বলুন তো?

বৃদ্ধা নিশ্চয়ই টের পেয়েছিলেন আমার চাপা উষ্মা। গলার ঝুলে পড়া চামড়া নাড়িয়ে একটা ঢোক গিলে বললেন—রাগ কোরো না, বাবা। তুমি কি পুণ্যিচ্চান করেছো?

—আজ্ঞে না। আমি বড্ড শীত কাতুরে। তাছাড়া···

বৃদ্ধা আমার কথা আর শুনতেই চাইলেন না। তার মধ্যেই বললেন সেই জন্যেই ডাকছিলুম। রুক্ষ চেহারা দেখেই মনে হচ্ছিলো ডুব দাওনি।

কথা বলতে বলতেই দেখি, বৃদ্ধা কাঁপা কাঁপা হাতে তাঁর শিশির ছিপি খুলছেন। তারপর শিশি কাত করে খানিকটা জল ঢেলে নিলেন হাতে। বললেন—কিছু মনে করিস না বাবা, সেকেলে মনুষ তো। খিষ্টানের সঙ্গে থেকে হিঁদুর ছেলে চান না করে গংগাসাগর থেকে ফিরবে—মাথায় ছ ফোঁটা সাগরের জল দিয়ে দেবো, তাই ডাকলুম।

কথা শেষ হতে না হতেই বৃদ্ধা তাঁর ঢিলে চামড়া শুকনো ডান হাতখানা উঁচু করে তুলে জলের ছিটে দিয়ে দিলেন আমার মাথায় গায়ে। সেই সঙ্গে বিড় বিড় করে বলেও গেলেন কি সব। বুঝলাম

না, শুনতেও পেলাম না। শুধু ঠোঁট নড়া দেখতে পেলাম। তারপর বললেন—এসো, বাবা এসো। ধীরে সুস্থে সাবধানে যাও, রাস্তা-ঘাটের যা অবস্থা…

বলতে বলতে বৃদ্ধা আমার দিকে আর না তাকিয়েই ফিরে চললেন।

তার ফিরে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম আরও কয়েকটা মুহূর্ত। একটু আগেই আমি বিরক্ত হয়েছিলাম, কান গরম হচ্ছিলো। অথচ এই মুহূর্তেই যেন নীরব অনুশোচনার এক শীতল স্নিগ্ধ প্রবাহ আমার মধ্যে। সেই সঙ্গে কী এক শান্তিরও যেন, যাকে ব্যাখ্যা করতে পারি না। আমার মধ্যে তো কোনো পাপবোধ নেই, সেই সঙ্গে বিশেষ কোনো পুণ্যচেতনা নিয়েও এখানে আসিনি। কিন্তু বৃদ্ধার চোখে. তাঁর মানসিকতায় এবং আজীবনের সংস্কারের কাছে সম্ভবত অনাচারী ছিলাম আমি। গোঁড়ামি আর অশান্তির খচখচে কাঁটা বিঁধছিল ওঁর বুকে। ওঁর শিশির কয়েক ফোঁটা জল, যা নাকি পুণ্যসলিল, তার ছিঁটে আমার গায়ে দিয়ে উনি নিজেই যেন দায়মুক্ত হলেন। ওঁর পুণ্য করতে আসা যেন সম্পূর্ণ হতো না ওইটুকু না করলে। কয়েক ফোঁটা জল গায়ে লাগায় আমার বিন্দু-মাত্র ক্ষতি হয়নি। কিন্তু বৃদ্ধা অনেক শান্তি পেয়েছেন। আমার লাভ এবং আনন্দও হলো সেটুকু ভেবে, আমি একজনের নিশ্চিন্ত হওয়ার স্বস্তি পাওয়ার কারণ হয়েছি।

বাঁশের গেট পার হয়ে বেরিয়ে এলাম। চড়া রোদ্দুর ওঠার প্রস্তুতি চলেছে। উত্তাল তরঙ্গের মতো ব্যস্ত মানুষের জিনিষপত্র নিয়ে যাতায়াত। দলে দলে কাতারে কাতারে কোলাহল মুখর খুশি মানুষের মিছিল এখন উঠে আসছে বালুচর ছেড়ে। এগিয়ে চললাম সেই মানব সমুদ্রের স্রোতে ভাসতে।